ফিওদর দস্তয়েভ্‌স্কি

অভাজন

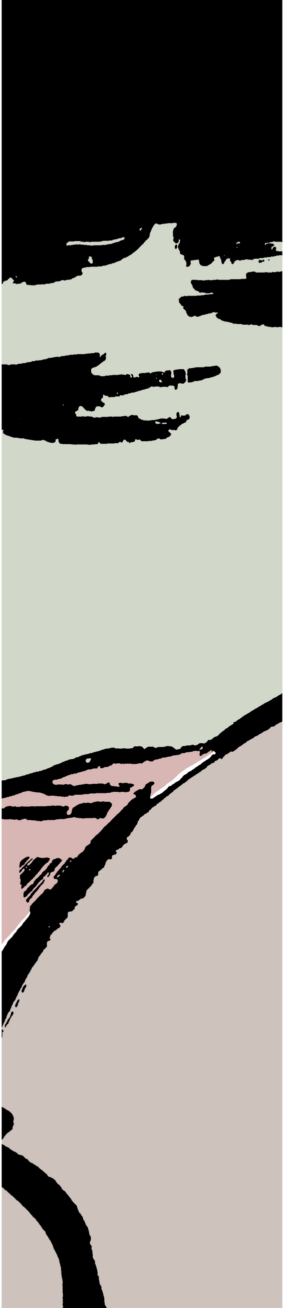

'... আগে আমি যাকে প্রধানত মানবতাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছি সে ধারার এক প্রধান ধারক হলেন:... দস্তয়েভ্‌স্কি। 'অভাজন' বইটি গোগলের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য এবং বেলিন্‌স্কির সবলতম ভাবাদর্শ দ্বারা সরাসরি অনুপ্রাণিত। দস্তয়েভ্‌স্কি এখানে আমাদের হতভাগ্য বাস্তবতার অস্বাভাবিকতা বর্ণনা করেছেন তরুণ এক প্রতিভার বলিষ্ঠ আবেগ নিয়ে এবং তার মধ্য থেকে রূপায়িত করে তুলেছেন তাঁর মহান মানবতাবাদী আদর্শটিকে।'

ন. দব্রলিউবভ

'হাসায় অথচ পাঠকের মর্মস্পর্শ করে যায়, হাসায় অশ্রুর মধ্যে দিয়ে — কি ওস্তাদি, কি প্রতিভা।'

ভ. বেলিন্‌স্কি

ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি ৬

অভাজন

চিরায়ত
রুশ
সাহিত্য

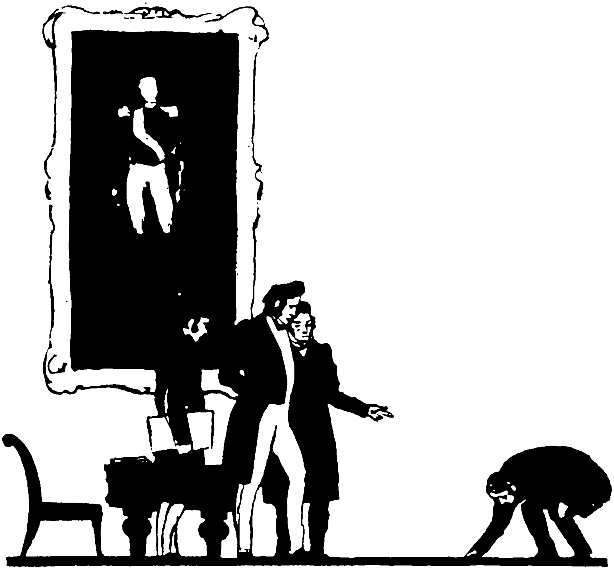

Федор Достоевский

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Москва

ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি

অভাজন

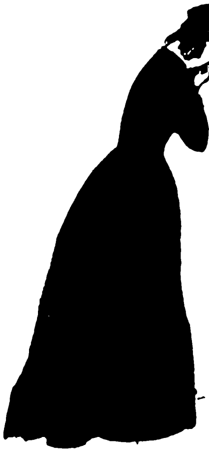

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ভেনিয়ামিন ভাসভ

ফ. ম. দস্তয়েভ্স্কি

মানুষের যন্ত্রণায় অভিভূত এক মহান আত্মার বিয়োগাত্মক কাহিনীই হল দস্তয়েভ্স্কির জীবন-কাহিনী। সামাজিক অবিচার এবং মানবিক দুঃখের জগদ্দল পাথরকে উত্থিত করেছিল তাঁর প্রতিভা, এবং পরিশেষে ভেঙেও পড়েছিল তারই চাপে।

ফিওদর মিখাইলভিচ্ দস্তয়েভ্স্কির (১৮২১—১৮৮১) জন্ম মস্কোতে। পৌর দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসক। সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গ সামরিক ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল থেকে দস্তয়েভ্স্কি ১৮৪৩ সালে পাশ করে ইঞ্জিনিয়রিং-এর সরকারি দপ্তরের নক্সা আপিসে প্রবেশ করেন। এ কাজ ভালো না লাগায় ১৮৪৪ সালে তাতে ইস্তফা দিয়ে সাহিত্যে মন দেন।

'অভাজন' (১৮৪৬) তাঁর প্রথম উপন্যাস। এটি রচনা করে তিনি বিখ্যাত হন।

নিপীড়িত মানুষের উদ্দেশ্যে এটি লেখা। তাদের এঁকেছেন তিনি দরদ ঢেলে, সহানুভূতি দিয়ে। প্রধান চরিত্র মাকার আলেক্সেয়েভিচ্ দেভুশ্কিন একজন ধিক্কৃত গরিব হতভাগ্য কেরানি, জীবনে এতই পর্যুদস্ত যে সে অসুখী এ কথাটুকু স্বীকার করতেও তার ভয়।

পর পর কতকগুলি চিঠি দিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে। সে চিঠি সম্পর্কে লেখক নিজে কোনো মন্তব্য করতে যাননি। এবং এতে

করে নায়কের যে মন মাঝে মাঝে হাস্যকর এমন কি তুচ্ছ বলে মনে হবে তার অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে।

গোগলের ছাত্র ও বেলিন্স্কির অনুরাগী ফ. ম. দস্তয়েভ্স্কি প্রথম দিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ধারা গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁর মানসিক ও সাহিত্যিক বিকাশ কিন্তু রূঢ়ভাবে প্রতিহত হয়ে যায়। তদানীন্তন প্রগতিশীল রুশ বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক গোষ্ঠী প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কের জন্য তাঁর বিচার হয়। বিচারে আদেশ হয়েছিল প্রাণদণ্ডের। নকল প্রাণদণ্ডের এক অপমানকর অনুষ্ঠানের পর সে দণ্ড অবশ্য নির্বাসন-দণ্ডে কমিয়ে আনা হয়।

দশ বছর পরে যখন তিনি ফিরলেন, তখন তিনি আর ঠিক আগের মানুষটি নন। 'মনুষ্য-প্রকৃতিতে'ই তখন তাঁর আস্থা হারিয়েছে। আশ্রয় খুঁজলেন তিনি ধর্মের মধ্যে।

'অভাজন'-এর লেখক পরবর্তী জীবনে সেই রকমের একটা খ্রীষ্টীয় নিষ্ক্রিয় প্রেমে উপনীত হয়েছিলেন, যার সম্পর্কে আ. ই. গের্ৎসেন লিখেছিলেন: 'নিষ্ক্রিয় প্রেম খুবই তীব্র হতে পারে, সে প্রেম কাঁদে আর কথা কয় আর চোখ মোছে, কিন্তু মুশকিল হল এই যে সে প্রেম কিছুই করে না।'

মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাবার ফলে দস্তয়েভ্স্কির রচনায় সামাজিক অবিচার উদ্ঘাটন করতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভাব নেহাৎ কম প্রকাশ পায়নি; সামাজিক অধোগতি ও অন্যায় সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় ভাবনার মধ্যেই তিনি মানুষকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। তা সত্ত্বেও, তাঁর রচনার যা সত্য, তা নষ্ট হবার নয়।

জ্বালালে ওই কাহিনীকারগুলো! বেশ কাজের আর আনন্দের আর উপাদেয় গোছের কি তারা কিছু লিখতে পারে না? তা না, কেবল যতো ধুলো ওদের ঘাঁটতেই হবে!... আমি হলে লেখা ওদের একেবারেই নিষিদ্ধ করে দিতাম। কি লাভ ও লেখায়? ও লেখা পড়লেই ভাবনা না করে তো থাকা যাবে না — আর যত রাজ্যের প্রলাপ এসে ঢুকবে মগজের মধ্যে। একেবারেই লেখা বন্ধ করে দিতে চাই আমি, সত্যিই চাই!

প্রিন্স ভ. ফ. ওদোয়েভ্স্কি

৮ই এপ্রিল

আদরের ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না।

কাল রাতে কি আনন্দই না হয়েছিল, কি অসম্ভব আনন্দ। জীবনে এই প্রথম গোঁয়ার মেয়ে, আমার কথামতো কাজ করলে। ঘুম ভেঙেছিল সন্ধ্যে আটটায়, (জানোই তো, কাজের পর একটু গড়িয়ে নেওয়া আমার অভ্যেস) মোমবাতি এনে, কাগজপত্র গুছিয়ে খাগের কলমটা কাটছি, এমন সময় মুখ তুলে তাকিয়েই—ওহ্‌ এমন ধ্বক করে উঠল বুকখানা। তাহলে তুমি টের পেয়ে

গেছ আমি কি চাইছিলাম, কি চাইছিল আমার মন। যা বলেছিলাম ঠিক তেমনি করে তোমার জানলার পর্দার কোণটি বালসাম ফুলের টবের সঙ্গে বাঁধা। এমন কি এও মনে হল যেন তোমার ছোট্ট মুখখানা জানলায় দেখা যাচ্ছে, আমার কথা ভেবে তুমি উঁকি দিয়ে দেখছ। তোমার সেই আদরের মুখখানাকে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না বলে কি কষ্টই না হচ্ছিল! কি আর বলব, এক কালে আমিও সব কিছুই পরিষ্কার দেখতে পেতাম। বার্ধক্যের বড়ো জ্বালা, ডার্লিং। সব কিছুই ঝাপসা দেখায়। তাছাড়া সন্ধ্যেয় একটুখানি কাজ করেছ তো অমনি সকালে চোখ এমন করকর করবে, জল ঝরতে থাকবে যে বাইরের লোকের কাছে সে মূর্তি দেখাতে লজ্জা করে। যাক, দেখতে না পেলেও মন আমার আলো হয়ে উঠেছিল তোমার হাসির কথা ভেবে। কি মিষ্টি তোমার সেই হাসি! তোমায় যখন প্রথম চুমু খেয়েছিলাম, মনে আছে?—ঠিক তেমনি লাগছিল, এমন কি এও মনে হল যেন তোমার আঙুলখানা তুলে আমায় তুমি বকুনি দিচ্ছ। সত্যি বকছিলে নাকি? পরের চিঠিতে সবটা খুলে জানাবে।

আর ঐ পর্দার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের কায়দাটুকু

কেমন লাগল? চমৎকার, তাই না? কাজই করি, কি শুতেই যাই, কি জেগেই থাকি, ওটা দেখলেই আমি টের পেয়ে যাব ওখানে বসে বসে তুমি আমার কথাই ভাবছ, আমাকে মনে পড়ছে তোমার, আর কুশলে আছ তুমি। পর্দা নামিয়ে দিলে তার মানে হবে: 'শুভরাত্রি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!' আর পর্দা তুলে দেওয়ার মানে: 'সুপ্রভাত, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, ভালো ঘুম হয়েছে আশা করি' কিংবা 'কেমন আছ, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্? ঈশ্বরের কৃপায়, আমি ভালোই আছি।' দেখছ, কেমন কাজ দেবে ব্যাপারটায়? এমন কি চিঠিপত্র লেখারও তেমন দরকার হবে না। বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে বার করা, তাই না? আর এ সবটাই কিন্তু আমি ভেবে ভেবে ঠিক করেছি! কি বলো, এ সব জিনিস আমার আসে ভালো, তাই না?

এরপর, আমার আদরের রাণী ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না, তোমাকে জানাই যে কাল রাত্রে আশাতীত ভালো ঘুম হয়েছে। বেশ সন্তোষজনক ঘুম। নতুন জায়গায় সাধারণত ঘুম আসে না। হয় এটা নয় সেটা—একটা না একটা কিছুতে ঘুম নষ্ট হবেই। কিন্তু সকালে আমি ঘুম ভেঙে উঠেছি একেবারে যেন আকাশের পাখির মতো ফুর্তি

আর তাজা ভাব নিয়ে। আর কি সুন্দরই না আজকের সকালটা! জানলা খোলা, সূর্য উঠেছে, পাখিরা গাইছে, বাতাসে বসন্তের সুবাস, সমস্ত প্রকৃতি সজীব—সব কিছুই বেশ মানানসই—বসন্তে যা হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি। আজ সকালে এমন কি কিছু সুখের স্বপ্নেও মন ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভারেঙ্কা, আর সে সবই কিন্তু তোমাকে নিয়ে। মনে মনে তোমার তুলনা করছিলাম আকাশের এক ছোট্টো পাখির সঙ্গে—প্রকৃতির রূপ আর মানুষের আনন্দের জন্যে সে পাখির সৃষ্টি। ভাবতে গিয়ে মনে হল, ভারেঙ্কা, কি দুঃখকষ্ট চিন্তাভাবনা নিয়েই না আমাদের, মানুষদের জীবন—আকাশের ঐ চিন্তাহীন নিরীহ পাখিগুলোকে আমাদের হিংসাই করা উচিত। এমনি ধারা নানা চিন্তায় মন ছেড়ে দিয়েছিলাম—নানা রকম আবছা আবছা সব তুলনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। আমার কাছে একটা বই আছে ভারেঙ্কা, তাতে এই ধরণের নানা সব কথা আছে, আর আছেও বেশ বিশদ করে। নানা রকমের কত স্বপ্ন যে আমার মনে আসে, ভারেঙ্কা, সে সব কথা না লিখে পারছি না। বসন্তকাল বলে সে সব স্বপ্ন এমন জলজলে, এমন স্নিগ্ধ, সুকুমার আর নরম—সবকিছুই বেশ গোলাপী

রঙে রাঙা। সেই জন্যেই এই সব আমি লিখছি। অবিশ্যি, সত্যি কথা বলতে গেলে, এ সব কথা আমি পেয়েছি বইটা থেকে। লেখকের মনের বাসনা হুবহু একেবারে আমার মতো — লিখেছেও সবই কবিতা দিয়ে:

হতাম যদি পাখি আমি,
আকাশে ওড়া শিকারী এক পাখি।

এমনি ধারা কত কি। অন্য রকম সব কথাও তাতে আছে, কিন্তু যাক গে সে কথা। বরং বলো, আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলে তুমি। তুমি যখন ভারি খুশি হয়ে ঘর থেকে বসন্ত-প্রজাপতিটির মতো বেরোলে তখনো আমি কাজে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে উঠতে পারিনি। তোমাকে দেখেও সুখ। সত্যি ভারেঙ্কা, ভারেঙ্কা আমার, দুঃখু কোরো না। কেঁদে কি লাভ বলো। অভিজ্ঞতা থেকে এই আমি বুঝেছি, বিশ্বাস কোরো। তাছাড়া, এখন তো তুমি শান্তিতেই আছ, শরীরও ভালো। ফেদোরা কেমন আছে? ভারি ভালো মেয়েটি! চিঠির উত্তর দিয়ো, ভারেঙ্কা, আর লিখো, কেমন চলছে তোমাদের দুজনে। সব কিছুই বেশ সন্তোষজনক তো? ফেদোরা একটু আধটু গাঁইগুঁই করে বটে, কিন্তু তা নিয়ে ভেবো না। ভারি ভালো মেয়ে ও, ভগবান ওর ভালো করুন।

তেরেসা সম্পর্কে আগেই লিখেছি — এ মেয়েটাও বেশ সৎ আর ভালো। চিঠিপত্র কি করে দেওয়া নেওয়া করব ভেবে এমন ভাবনা হয়েছিল! কিন্তু ভগবান ভাগ্যক্রমে তেরেসাকে পাঠিয়েছেন। মেয়েটি নম্র, বাধ্য, দয়াধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের বাড়িউলী বড়ো নির্দয়, মেয়েটিকে খাটিয়ে খাটিয়ে মারে।

কি জায়গাতেই যে এসে পড়েছি, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না, একেবারে নিতান্ত বস্তি! ঘরের কি ছিরি! আগে ছিলাম একেবারে আশ্রমের মতো নিরিবিলিতে — সে তো জানো। এত শান্ত যে মাছিটা উড়লেও তার শব্দ কানে যেত। আর এখানে কেবলি গোলমাল, চিৎকার, হৈচৈ। কিন্তু জায়গাটা কেমন তা বোধহয় তোমাকে আগে জানাইনি। মনে মনে ভেবে নাও — একটা লম্বা বারান্দা, বেদম অন্ধকার আর নোংরা। ডান দিকে ন্যাড়া দেয়াল। বাঁ দিকে সারি সারি দরজা, ঠিক হোটেলের মতো, এক একটা ঘর একজন দুজন এমন কি তিন তিনজনেও ভাড়া নিয়ে আছে। সব কিছুই এলোমেলো, গণ্ডগোলে — একেবারে নোয়ার নৌকো একখানা! অথচ মনে হয় লোকগুলো ভালোই — শিক্ষাদীক্ষা বেশ আছে। এদের একজন হল কেরানি

(সাহিত্যের সঙ্গেও কেমন একটা সংস্রব আছে), বেশ পড়াশুনা আছে লোকটার, হোমার, ব্রাম্‌বেউস* এবং আরো নানা রচনা নানা ব্যাপার সম্পর্কে বহু কিছু জানে — ভারি বুদ্ধিমান লোক। তাছাড়া আছে দুজন সামরিক অফিসার — সবসময়েই তারা তাস খেলে। একটি নৌবাহিনীর অফিসারও আছে এবং আছে একটি ইংরাজি শিক্ষক। কিন্তু সে সব পরের চিঠিতে। তোমাকে খুশি করার জন্যে ওদের বিস্তারিত এবং হুবহু বর্ণনা দেব, একটু ব্যঙ্গ করে। আমাদের বাড়িউলী হলেন বেশ ছোটোখাটো দেখতে নোংরা গোছের এক বুড়ি; ঘোরেন ড্রেসিং গাউন আর শ্লিপার পরে এবং সারা দিন ধরে তম্বি করেন তেরেসার ওপর। আমি থাকি রান্নাঘরে, মানে ব্যাপারটা হল এই: রান্নাঘরের ঠিক লাগোয়া একটা ঘর আছে (আমাদের রান্নাঘরখানা কিন্তু ভারি সুন্দর, ঝকঝকে, তকতকে), ঘরখানা বড়ো নয়, নিতান্ত একটা ঘুপচি... অথবা বরং এই ভাবে বলা ভালো, রান্নাঘরখানা বড়োসড়ো, তিনটে জানলা। সেটাকে পার্টিশন করে আর একটা ঘর তৈরি করা হয়েছে,

---

* ব্যারন ব্রাম্‌বেউস — ও. ই. সেনকোভ্‌স্কির ছদ্মনাম। গত শতাব্দীর চল্লিশে নানা বিষয়ে লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

বাড়তি এক জনের বাস করার মতো। বেশ প্রশস্ত, এবং আরামদায়ক, একটা জানলাও আছে। এইখানেই আমি থাকি। মোটের ওপর সব মিলিয়ে বেশ সন্তোষজনক। এ থেকে কিন্তু ভেবে বসো না যে আমার কথার কোন একটা উহ্য অর্থ আছে, ভেবো না যে ঘরখানা রান্নাঘরেরই একটা অংশ মাত্র। যদিও রান্নাঘরেই আমি থাকি, কিন্তু পার্টিশনের পেছনে গেলেই আর কোন ভাবনা নেই— আমি আমার নিজের মতো শান্তিতে একদম একা থাকতে পারি। আসবাব হিসেবে আমার আছে একটা বিছানা, একটা টেবিল, দেরাজওয়ালা সিন্দুক আর দুটি চেয়ার। একটি আইকনও টাঙিয়ে নিয়েছি। আমার চেয়ে ভালো ঘর অবশ্যই থাকা সম্ভব, এর চেয়ে অনেক ভালো ঘরই হয়ত আছে, কিন্তু আসল কথা হল আরাম, তাই না? এবং এই আরামের কথা ভেবেই আমি এ সব করেছি, কখনো ভেবো না যে এর পেছনে অন্য কোনো হিসেব ছিল। তাছাড়া তোমার জানলাটা ঠিক আমাদের আঙিনার ওপারেই। আঙিনাটাও সরু, তাই তোমার যাওয়া আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই— নিঃসঙ্গ লোকের পক্ষে সেটা আরো আনন্দের কথা। সস্তাও বটে। খাওয়া সমেত এখানকার সবচেয়ে দামী

ঘরের ভাড়া পঁয়ত্রিশ রুবল—ও টাকা আমার সাধ্যের বাইরে! খাওয়া নিয়ে আমার এ ঘরখানায় পড়ে কিন্তু সাড়ে চব্বিশ, অথচ এর আগে আমার খরচা হত পুরো তিরিশ, ফলে অনেক কিছুই ছাঁটাই করতে হত আমাকে। আগে সবদিন চা খাওয়া সম্ভব হত না, এখন চা চিনি দুটোই জোগাবার মতো পয়সা আমি বাঁচাতে পারি। চা না খেয়ে কিছুতেই পারা যায় না, ভারেঙ্কা। এখানকার সবাই বেশ সম্ভ্রান্ত, ফলে অস্বস্তি লাগে। সেইজন্যেই চা খেতে হয় লোকেদের জন্যে, ভদ্রতা করে আর কি! নইলে আমি পরোয়া করতাম না, অত খুঁতখুঁতি আমার নেই। এর ওপর যদি আচমকা দরকারের জন্যে কিছু জমিয়ে রাখতে হয়, পোষাকটা কি জামাটা জুতোটার জন্যে তাহলে আর কি থাকে। পুরো মাইনেটাই খতম। ভেবো না, নালিশ করছি—এতদিন এই মাইনেই তো যথেষ্ট হয়েছে, মাঝে মাঝে এর ওপর বোনাসও পেয়েছি।

যাই হোক, বিদায় ভারেঙ্কা। তোমার জন্যে বালসাম ফুলের দুটো টব আর জিরেনিয়েম কিনেছি—বেশ সস্তা। নাকি তোমার পছন্দ মিগ্‌নিয়োনেত্? মিগ্‌নিয়োনেত্-ও আছে ওদের কাছে, চাও তো লিখো। কিন্তু দয়া করে লিখো আরো একটু খুঁটিনাটি জানিয়ে। আর

ইতিমধ্যে আমার জন্যে কোনো চিন্তা করবে না, এ রকম একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি বলে কোনো রকম সন্দেহ মনে রেখো না। এ ঘর নিয়েছি শুধু আরামের জন্যে, আর কিছু নয়। টাকা আমি জমাচ্ছি, ভারেঙ্কা, বাসা বাঁধার টাকা। কিছু টাকা আমার আছে। আমাকে দেখে মনে হতে পারে যে একটা মাছিও বুঝি ডানা দিয়ে উল্টে ফেলে দিতে পারে এত নগণ্য আমি, কিন্তু ভেবে দেখলে দেখবে আমি সত্যিই তো আর সে রকম নই—আমার যা করণীয় তা আমি ভালো করেই জানি। দৃঢ়চেতা প্রশান্ত আত্মা এক মানুষের মতোই আমার চরিত্র। বিদায়, আমার আদরের দেবী, দেখছি পুরো দুই পাতা আমি লিখে ফেলেছি অথচ অনেক আগেই আমার কাজে বসে যাওয়া উচিত ছিল। তোমার ছোট্টো আঙুলগুলোর জন্যে আমার চুমু রইল।

চিরকালই তোমার একান্ত বশংবদ সেবক ও অকৃত্রিম বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

পুঃ দোহাই তোমার, যতটা সম্ভব বেশি করে লিখো। এক পাউণ্ড মিষ্টি পাঠালাম, ভারেঙ্কা, আশা করি ভালো লাগবে এবং ঈশ্বরের দোহাই, আমার সম্পর্কে কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না। পুনরপি বিদায়।

৮ই এপ্রিল

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

তোমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ঝগড়া করতে হবে দেখছি। তোমাকে বারবার করে বলছি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, উপহার দিতে গিয়ে তোমাকে যে দাম দিতে হচ্ছে, যে কষ্ট আর আত্মকৃচ্ছ্রতা সইতে হচ্ছে তা জানি বলেও উপহার গ্রহণ করা আমার পক্ষে সত্যিই ভারি কঠিন। কতবার না তোমায় বলেছি, আমার কিছু চাই না, কিছুটি না? তুমি জান, তোমার বদান্যতা পরিশোধ করার সাধ্যি আমার নেই। ফুলগুলো পাঠালে কেন? বালসামের একটা শাখা হলেও নয় হত, কিন্তু ঐ জিরেনিয়েমগুলো আবার কেন? মুখ থেকে কোনো একটা কথা খসলেই তুমি ছুটবে সেটা কিনতে—যেমন এই জিরেনিয়েমের বেলায় করলে। নিশ্চয় বেশ দাম দিতে হয়েছে? দেখতে কিন্তু বেশ, ছোট্টো লালচে ফুলের ক্রশ। কোথায় পেলে? জানলার মাঝখানে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো জায়গায় ওগুলোকে রেখেছি। নিচে একটা বেঞ্চিও দিয়ে দেব, বেঞ্চির ওপরে রাখব আরো ফুল—একটু সবুর করো, আর একটু পয়সা জমুক আগে। ফুলগুলো দেখে দেখে

ফেদোরার যেন আর আশ মেটে না। ঘরটা এখন ভারি চমৎকার—ঝকঝকে তকতকে! কিন্তু মিষ্টিগুলো পাঠালে কেন আবার? তোমার চিঠি পেয়ে মনে হচ্ছে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে—স্বর্গ আর বসন্ত আর সৌরভ আর পাখির গানের কথা রয়েছে একটু অতিমাত্রায়। একটু কবিতা থাকলেও মানাত। নিশ্চয় কিছু কবিতাও লিখে ফেলেছিলে, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্? তাছাড়া আর সবই তো রয়েছে, কোমল হৃদয়াবেগ, গোলাপী কল্পনা এবং কি নয়! পর্দাটা সম্পর্কে কিন্তু আমি ও সব কিছুই ভাবিনি। টবের চারাগুলো বদলিয়ে রাখার সময় সম্ভবত পর্দাটা আটকে গিয়ে থাকবে। বুঝেছ!

কিন্তু মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, যতই বলো আর যা করেই বোঝাবার চেষ্টা করো যে তোমার টাকা তুমি নিজের জন্যেই খরচ করছ, আমার কাছ থেকে লুকোতে পারবে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার জন্যে তুমি তোমার নিতান্ত প্রয়োজনগুলিকেও ছাঁটাই করতে শুরু করেছ। এ রকম একখানা ঘরে গিয়ে ওঠার বা কি দরকার পড়ল্ তোমার, যেখানে সারাক্ষণ তোমায় দুর্ভোগ আর জ্বালাতনের মধ্যে থাকতে হবে, যেখানে অত ঠাসাঠাসি আর অসুবিধা? নিজের জন্যে তোমার

একটু আড়াল দরকার—ওখানে তার বালাই নেই। যা মাইনে পাও, তাতে এর চেয়ে অনেক ভালোভাবেই তুমি থাকতে পার। ফেদোরা বলে, তুমি এর চেয়ে অনেক ভালোভাবেই তো ছিলে। এ কি সত্যি যে সারা জীবনই তুমি কাটিয়েছ একা একা, অভাব অনটন নিরানন্দের মধ্যে, কারো কাছ থেকে মিষ্টি কথা শোনোনি, উটকো আনাচে কানাচে ঘর ভাড়া নিয়েছ অজানা অচেনাদের কাছ থেকে। দরদী বন্ধু আমার, তোমার জন্যে বুকের ভেতরটা এমন টনটন করে ওঠে যে কি বলব! অন্তত শরীরটার দিকে নজর রেখো, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। লিখেছ মোমবাতির আলোয় লিখলে তোমার চোখ করকর করে। তাহলে লেখো কেন? তোমার আপিসের কর্তারা তো এমনিতেই জানে তুমি কি ভীষণ পরিশ্রমী।

ফের অনুরোধ করি, দয়া করে আমার জন্যে অত পয়সা খরচ করো না। আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাস, কিন্তু তুমি তো বড়োলোক নও... আজ সকালে আমিও ঘুম ভেঙে উঠেছি 'বেশ তাজা মন নিয়ে। ভারি ভালো লাগছিল। বেশ কিছু কাল ধরে ফেদোরা কাজ করছে। আমার জন্যেও কাজ নিয়ে এসেছিল সে। ফলে খুশি

হয়ে উঠেছিলাম খুব। বাইরে গিয়েছিলাম কিছু সিল্ক কিনে আনার জন্যে, ফিরে এসে বসেছিলাম কাজ নিয়ে। সারা সকাল মনটা বেশ হালকা আর খুশি ছিল! কিন্তু এখন আবার খারাপ লাগছে, ভার ভার লাগছে মন।

কি হবে আমার? কি আছে আমার কপালে? কোনো একটা পথ নেই, কি ঘটবে তার এতটুকু ধারণা পর্যন্ত নেই, এই অনিশ্চয়তা এমন মন খারাপ করে দেয়। আর অতীত—সেটা এতই ভয়ঙ্কর যে ভাবতে গেলেই বুক ভেঙে যায়। সারা জীবন আমাকে কেঁদেই যেতে হবে, কুলোকের হাতে পড়ে জীবন আমার নষ্ট হয়ে গেল!

কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছে, কাজে বসতে হবে। আরো অনেক কথা লেখার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সময় নেই। কাজটা জরুরী, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। চিঠি লেখাটা বেশ ভালো, সন্দেহ নেই, অত একলা লাগে না, তাই বলে আমাদের এখানে আস না কেন তুমি? কেন, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্? এখন তো তোমায় বেশি দূর যেতে হবে না, এটুকু সময় তোমার নিশ্চয়ই হবে। সত্যি, এসো! এই মাত্র তোমার তেরেসার সঙ্গে দেখা হল। ভারি অসুস্থ দেখাচ্ছিল ওকে। এত দুঃখ

হল যে ওকে কুড়ি কোপেক দিয়ে দিয়েছি। ওহো, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম: তুমি কেমন ভাবে আছ তার একটা পুরো বিবরণ দিয়ো দয়া করে। তোমার সঙ্গে যারা থাকে, তারা কেমন লোক, কেমন চলছে তাদের সঙ্গে? ভারি জানতে ইচ্ছে করে। সবকিছু লিখতে হবে কিন্তু! আজ রাত্রে আমি ইচ্ছে করেই পর্দার কোনটা তুলে দেব তোমার জন্যে। সকাল সকাল শুতে যেয়ো — কাল দেখেছিলাম, প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত তোমার বাতি জ্বলেছে। তাহলে, আসি! এত বিষণ্ণ আর ক্লান্ত আর নিঃসঙ্গ লাগছে আজকে। এমনিই দিন আজকে। বিদায়!

তোমার বন্ধু,

ভার্‌ভারা দব্র‌সিওলভা

৮ই এপ্রিল

আদরের ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না!

সত্যি, ডার্লিং, সত্যি আমার আদরের রাণী, আমার পোড়া কপালে শুধু এমনি ধারাই দিন! বুড়ো মানুষ আমি — আমার রকম সকম দেখে নিশ্চয় তোমার মজা লেগেছিল, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না। কিন্তু সেটা

আমারই দোষ, পুরোপুরি আমার! বুড়ো মানুষ, দুটি খানিক চুল টিঁকে আছে মাথায়, সে কিনা মদন দেব আর হৃদয়াবেগ নিয়ে মেতেছে... তবু এ কথা বলবই, ভারেঙ্কা, মানুষ ভারি এক আশ্চর্য প্রাণী। মাঝে মাঝে এমন ভীষণ রকমের অর্থহীন কথা সে বলে, এমন চূড়ান্ত করে ছাড়ে—যে কি বলব! কিন্তু কি হয় তাতে, কি লাভ? কিছুই না, লাভ শুধু কতকগুলো রাবিশ যা থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করলে বাঁচি। না, রাগ করিনি, ডার্লিং, শুধু ভেবে অস্বস্তি লাগছে যে আমি তোমায় অমন নির্বোধ আর উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখতে পারলাম কেমন করে। আজ আমি কাজে গিয়েছিলাম রাজার মতো সুখী মন নিয়ে। আমার হৃদয় যেন আলো হয়ে উঠেছিল, আমার আত্মায় যেন ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠেছিল! সংক্ষেপে, বেশ ফুর্তি বোধ করছিলাম। বেশ ফুর্তি করেই কাগজপত্র টেনে নিয়ে শুরু করেছিলাম প্রথমটা। কিন্তু খানিক বাদেই সবকিছু হয়ে উঠল সেই আগের মতোই একঘেয়ে নিরানন্দ। কালির দাগ আগেও যা ছিল, তাই রয়ে গেল, টেবিল আর কাগজপত্র আর আমিও ঠিক যা ছিলাম তাই। তবে আর পক্ষিরাজের পিঠে চেপে উধাও হতে যাওয়া কেন? কিসের পাল্লায় পড়ে

এমন একটা কাণ্ড করে বসলাম আমি? এই জন্যে কি যে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল আমার ওপর আর নীল হয়ে গিয়েছিল আকাশ? আমাদের জানলার নিচের আঙিনায় যে সব বিচিত্র ব্যাপার চলে তার কাছে কি আর সৌরভ আসতে পারে? ব্যাপারটা সবই বানিয়েছি আমার নির্বোধ দিবাস্বপ্ন থেকে: নির্বোধ ভাবাবেগের আধিক্যে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছি। অথচ এই সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরার সময় আমি এসেছি ঠিক হেঁটে তো নয়, যেন কোনোক্রমে নিজেকে ঠেলতে ঠেলতে। তাছাড়া, কিসের জন্যে যেন মাথাটাও ব্যথা করতে শুরু করেছিল। একটা না একটা কিছু লেগেই আছে আমার। (হয়ত বাতাস লেগে পিঠে ঠাণ্ডা বসেছে) বসন্ত এসেছে বলে এতই খুশি হয়ে উঠেছিলাম যে বোকার মতো বেরিয়েছিলাম শুধু একটা পাতলা আপিসের কোট পরে।

তোমাকে জানিয়ে দেওয়া ভালো, যে আমার মনোভাব তুমি ভুল বুঝেছ—একেবারেই ভুল বুঝেছ! এ হল এক রকম পিতৃসুলভ স্নেহ, নিতান্তই পিতৃসুলভ, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না। নিঃসঙ্গ অনাথ তুমি, এই অবস্থায় আমি তোমার পিতার স্থান নিয়েছি মাত্র। এ

কথা বলছি একেবারে অকপটে, সত্যিকারের আত্মীয়ের পক্ষে যেমন বলা উচিত। আসলেও তো আমি তোমার এক দূর আত্মীয়ই হই, তাই না? সম্পর্কটা অবশ্যই সেই সইয়ের বৌয়ের বকুল ফুলের মতো—তবু আত্মীয় তো। তাছাড়া এখন তো আমি তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আর অভিভাবকই হয়ে পড়েছি, কেন না যাদের কাজ ছিল তোমায় সাহায্য করা তাদের কাছ থেকে তুমি পেয়েছ শুধু অপমান আর বিশ্বাসঘাতকতা। আর কবিতার কথা যদি বলো, তবে নিশ্চয় বলব, ভারেঙ্কা, যে এ বয়সে আর পদ্য রচনার বিলাস আমার শোভা পায় না। পদ্য হল গে বাজে জিনিস! আজকাল পদ্য লিখলে স্কুলের ছেলেরা পিটুনি খায়... এই হল আমার মত।

আরাম আর শান্তি আর বিশ্রামের ও সব কথা তুলেছ কেন ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না? খুঁতখুঁতে লোক আমি নই, অল্পেতেই আমার চলে যায়। এখনকার চেয়ে ভালো অবস্থায় আমি ইতিপূর্বে কদাচ ছিলাম না। বুড়ো বয়সে পৌঁছিয়ে অত খুঁতখুঁত করার কি দরকার? খাবার মতো যথেষ্ট আছে আমার, জামা জুতোও কিছু আছে। অপব্যয় করে কি লাভ? আমি তো আর রাজবাড়ির

দুলাল নই। না, আমার বাপ অভিজাত শ্রেণীর ছিলেন না। আমার চেয়েও কম রোজগারে তিনি পরিবার প্রতিপালন করে গেছেন। অপদার্থ আমি নই। তবে, সত্যি কথা বলতে, আমার পুরনো ডেরাটা এর চেয়ে ভালো ছিল। সেখানে অনেক স্বস্তি পাওয়া যেত, ভারেস্কা। আমার এখনকার ঘরখানাও অবশ্য বেশ ভালো, কোনো কোনো দিক থেকে বরং একটু বেশি আনন্দের, বলা যেতে পারে, বেশি জীবন্ত। এ ঘরের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই, তবু পুরনো ঘরখানার জন্যে মন কেমন করে বৈকি। জানোই তো, আমরা, বুড়ো মানুষেরা, মানে যাদের একটু বয়স হয়েছে তাদের কেমন একটু মায়া পড়ে যায় জিনিসপত্রে। ঘরখানা ছিল ছোটো আর দেয়ালগুলো ... মানে দেয়ালগুলো ঠিক যে কোনো দেয়ালেরই মতোই আর কি। দেয়াল বলে তো কিছু না, আসলে মন খারাপ লাগে সব স্মৃতির জন্যে ... স্মৃতিগুলো এমনিতে কিন্তু বেশ আনন্দের, অথচ ভাবতে গেলেই কেন যে কষ্ট লাগে, আশ্চর্য। এমন কি যেসব জিনিসগুলো খারাপ, যেগুলোতে বিরক্ত ধরে যেত, সেগুলোও এখন বেশ ভালো আর পবিত্র বলে মনে হতে শুরু করেছে। ওখানে কি শান্তিতেই না আমরা ছিলাম — আমি আর সেই বুড়ি

মেয়েটি—এখন আর সে বেঁচে নেই। ওর কথা ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যায়। বড়ো ভালো ছিল মেয়েটি, ঘরের জন্যে কখনো বেশি টাকা আদায় করেনি। মস্ত মস্ত লম্বা লম্বা সূচ দিয়ে মেয়েটি সারাক্ষণই কম্বল বুনত, সেলাই করত। একই মোমবাতি নিয়ে কাজ করতাম আমরা দুজনে, সেই জন্যে একই টেবিলে বসতে হত। বুড়ির ছোট্ট এক নাতনি ছিল মাশা—বাচ্চা মেয়েটিকে এখনো মনে পড়ে আমার—এত দিনে সে নিশ্চয় তেরোয় পড়েছে। কি বিচ্ছু ছিল মেয়েটা, কিছু না কিছু কাণ্ড ঘটাবেই—হেসে গড়িয়ে পড়তাম আমরা। এমনি করেই চলত আমাদের, আমাদের তিন জনের। শীতের সেই লম্বা রাতগুলোয় আমরা গোল টেবিলের চারপাশে বসে চা খেতাম তারপর কাজ শুরু করতাম। বাচ্চাটার মন ভুলিয়ে ওর দুষ্টুমি ঠেকিয়ে রাখার জন্যে বুড়ি গল্প বলত। আহা, কি সুন্দর সুন্দর সব গল্প! বাচ্চা তো বাচ্চা, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বড়োরা পর্যন্ত শুনতে শুনতে আত্মহারা হয়ে যেত। আমি পর্যন্ত পাইপ খেতে খেতে সে গল্প শুনতে শুনতে নিজের কাজের কথা ভুলে যেতাম বেমালুম। আর দুষ্টুমির ডিম সেই বাচ্চাটি ছোট্টো ছোট্টো হাতের

ওপর লাল টুকটুকে গালখানা রেখে শুনত মুখ হাঁ করে। যদি ভয়ের গল্প হত তাহলে দিদিমার গা ঘেঁসে সরে আসত সে। কি ভালোই না লাগত তখন ওকে দেখতে! বসেই থাকতাম আমরা, ভুলে যেতাম মোমবাতি দপ্‌দপ্‌ করছে, বাতাস বইছে আঙিনায়, শিরশির শব্দ উঠছে তুষারপাতের। সত্যি, বেশ ভালো কাটত ভারেঙ্কা, এই ভাবে প্রায় কুড়ি বছর আমরা কাটিয়েছি একসঙ্গে। কিন্তু আমার বকবকানি থামাই! সে প্রসঙ্গ বোধ হয় তোমার ভালো লাগবে না, আমার পক্ষেও সে স্মৃতি কম কষ্টের নয়, বিশেষ করে এখন। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, কি নিয়ে যেন তেরেসা ব্যস্ত। মাথা ধরেছে আমার, পিঠটাও ব্যথা করছে একটু, আমার ভাবনা-চিন্তাগুলোও এমন বিদঘুটে আর এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে যে মনে হয় সেগুলোও বুঝি অসুস্থ। আজ ভারি খারাপ লাগছে, ডার্লিং!

কিন্তু ও কি কথা লিখেছ তুমি? তোমার বাসায় যাওয়া সে কি করে হয়? লোকে কত কি বলবে যে। আঙিনা পেরলেই প্রশ্ন উঠবে, আলোচনা চলবে, গুজব রটবে। মিথ্যে মিথ্যে কথা বলবে সবাই। না, না, ও হয় না আমার ছোটো রাণী। তার চেয়ে বরং কাল সান্ধ্য

উপাসনার সময় দেখা করব, সেই ভালো, আমাদের দুজনের তাতে ক্ষতি কম হবে। এই রকম একটা চিঠি লেখার জন্যে আমায় মার্জনা কোরো, সবটা ফের একবার পড়ে দেখছি, এলোমেলো বিদঘুটে কথায় সব ভরা। আমি বুড়ো হয়েছি ভারেঙ্কা, বুড়ো আর বোকা। যখন বয়স ছিল তখন শিক্ষাদীক্ষা অল্পই পেয়েছি, তারপর এখন ফের প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলেও কিছুই মনে রাখতে পারি না। স্বীকার করতেই হবে ভারেঙ্কা, কিছু বর্ণনা করে বলায় আমার দক্ষতা নেই। কেউ আমাকে এ কথা না বললেও, এ নিয়ে ঠাট্টা না করলেও জানি যে যখনই আমি বেশ একটু কল্পনা মিশিয়ে কিছু লিখতে গেছি, তখনই জড়ো করে তুলেছি শুধু এক গাদা ছাইপাঁশ। আজ তোমায় জানলায় দেখতে পেয়েছিলাম, খড়খড়ি টেনে দিচ্ছিলে। বিদায় আজ, বিদায়, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। বিদায় ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না।

তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

পুঃ কারো সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মকভাবে কিছু লেখা আর আমার সাধ্যে নেই, ভারেঙ্কা। হাসি-ঠাট্টা করার বয়স আমার

পেরিয়ে গেছে, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না! তাছাড়া কাউকে নিয়ে যদি আমি হাসি, তাহলে লোকেও যে আমাকে দেখে হাসবে। মনে পড়ে সেই প্রাচীন রুশ প্রবাদ-বাক্যটির কথা: পরের জন্য গর্ত খুঁড়ে রাখলে নিজেও পা হড়কাবে।

৯ই এপ্রিল

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্‌।

উপকারী বন্ধু আমার, ছিঃ, অমন ক্ষোভ আর বিষাদে গা ছেড়ে দিতে হয় কখনো? তোমায় কি কোনো আঘাত দিয়েছি আমি? বড়ো অবিবেচক আমি জানি, কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমার কথাগুলোকে ভাববে তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা। তোমার বয়স বা স্বভাব নিয়ে উপহাস কখনো করিনি, এ তুমি জেনে রেখ। ব্যাপারটা ঘটেছে নেহাৎই আমার অবিবেচনার কারণে, হয়ত আরো এই কারণে যে আমার দিনগুলো বড়ো একঘেয়ে—আর একঘেয়ে লাগলে কি না করতে পারে মানুষ? সত্যি কথা বলতে, আমি ভেবেছিলাম চিঠিতে তুমি বুঝি একটু রহস্য করছ। যখন দেখলাম তুমি অপ্রসন্ন বোধ করেছ, তখন মন ভার হয়ে গেল আমার। বন্ধু এবং সহায় আমার, আমার অনুভূতি নেই,

কৃতজ্ঞতা নেই, এ কথা ভাবলে তুমি আমার ওপর অন্যায় করবে। শত্রুদের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে, তাদের ঘৃণা আর নিপীড়ন থেকে আমায় রক্ষা করে আমার জন্যে তুমি যা কিছু করেছ, তার মূল্য আমি বুঝি। ভগবানের কাছে চিরকাল আমি প্রার্থনা করে যাব, এবং ভগবান যদি আমার প্রার্থনা শোনেন, ধর্ম যদি থাকে, তাহলে তুমি সুখী হবে।

শরীরটা আজ বেশ অসুস্থ। পালা করে এক একবার কাঁপুনি ধরছে, এক একবার গরম লাগছে। খুব ভাবনায় পড়েছে ফেদোরা। এসে আমাকে দেখে যেয়ো, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, দ্বিধা কোরো না। লোকেরা নিজের চরকায় তেল দিক! আমাদের মধ্যে পরিচয় তো যথেষ্ট, তাই না? বিদায় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, যা বলবার সব বললাম, শরীর এত খারাপ যে এর বেশি আর লিখতে পারছি না। ফের বলি, আমার ওপর রাগ কোরো না, আমার শ্রদ্ধা আর অনুরাগ কখনো নষ্ট হবে না।

তোমার বিশ্বস্ততম বিনীত সেবিকা,

ভার্‌ভারা দব্রসিওলভা

১২ই এপ্রিল

প্রিয় ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না!

কি ব্যাপার? হয়েছিল কি? বার বার তুমি আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছ! প্রতি চিঠিতে আমি তোমায় মিনতি করে অনুরোধ জানাচ্ছি, একটু সাবধানে থেকো, গায়ে বেশ কিছু জড়িয়ে নিয়ো, আবহাওয়া খারাপ থাকলে ঘরের বার হয়ো না, সবকিছুই একটু বিবেচনা করে কোরো। কিন্তু, আদরের দেবী আমার, ছেলেমানুষের মতো কথা তো তুমি শুনবে না! তৃণের মতো পলকা তুমি তা যে আমি জানি, একটুখানি বাতাসেই তুমি ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসো। সতর্ক থাকা উচিত তোমার ভারেন্কা, ভয়ের থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হবে, মনোকষ্ট আর দুশ্চিন্তা থেকে তোমার বন্ধুদের বাঁচিয়ো।

আমার দৈনন্দিন জীবন আর পরিপার্শ্ব সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে? সানন্দে রাজী আমি, আমার রাণী। একেবারেই গোড়া থেকে শুরু করা যাক। বেশ গুছিয়ে আর কি। বাড়ির সামনেকার সিঁড়িটা বেশ শোভন, বিশেষ করে প্রধান সিঁড়িটা। ঝকঝকে, তকতকে, চওড়া, রেলিংগুলো সবই দামী কাঠ আর ধাতুর কাজ করা। কিন্তু খিড়কির সিঁড়ি সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই

মঙ্গল। সে সিঁড়ি উঠেছে পাক খেয়ে খেয়ে, যেমন স্যাঁৎসেঁতে তেমনি ময়লা, ভেঙে ভেঙে পড়ছে, দেয়ালগুলো এত নোংরা যে ছুঁলে আঙুল আটকে যাবে। প্রত্যেকটা তলায় স্তূপ করে রাখা বাক্স, চেয়ার, পুরোনো পোষাকের আলমারি, আর সারবন্দী কাপড় মেলার দড়ি। বেশির ভাগ জানলাই ভাঙা, এবং সর্বত্রই ধুলো, আবর্জনা, ডিমের খোসা, আর মাছের নাড়িভুড়িতে ভরা টব। অসহ্য গন্ধ... সংক্ষেপে বিশেষ ভালো নয়।

ঘরগুলোর ছক কি রকম তা তো আগেই বলেছি: আরামের বটে, তবে... মানে একটু ঘুপচি গোছের। ঘরগুলো থেকে সত্যি সত্যিই যে খারাপ গন্ধ ওঠে, তা ঠিক নয়—শুধু একটু পীড়াদায়ক পচা গন্ধ আর কি। প্রথমটা অস্বস্তি লাগে, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সয়ে যায়, কেন না এ গন্ধ লোকজন সকলের মধ্যেই —এমন কি পোষাকপরিচ্ছদ গা-হাতেও। গন্ধ পেয়ে পেয়ে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু ক্যানারি পাখিগুলো ঝটপট মরে যায়। নৌবাহিনীর যে অফিসারটি এখানে থাকে, সে তার পঞ্চম ক্যানারি পাখিটি সবে কিনেছে—এখানকার বাতাস ওদের কিছুতেই সহ্য হয় না। সকাল বেলায় সে বাতাসটা বেদম ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে, মাছ

মাংস রান্না হয় তখন, রান্নাঘরখানা হয়ে ওঠে জঘন্য, কিন্তু সন্ধ্যেয় লাগে ভারি সুন্দর। রান্নাঘরটা বড়ো আর ঝকঝকে, শুকোতে দেওয়া পুরনো পোষাকে ভর্তি, তার গন্ধটা ঈষৎ বিরক্তিকর, কেন না আমার ঘরখানা রান্নাঘরের ঠিক পাশেই। কিন্তু তাতে যায় আসে না বিশেষ, কিছুদিন ধরে এখানে থাকলে ওটা সয়ে যাবে।

অতি প্রত্যূষ থেকেই বাড়িখানায় সাড়া পড়ে যায়। সকলেই জেগে উঠে চলাফেরা করে, দুমদাম করে হাঁটে। কেউ কেউ কাজে যায়, কিন্তু যারা কাজে যায় না তারাও উঠে পড়ে সবাই। সবাই চা খাই প্রথমে। সামোভারের মালিক আমাদেরই বাড়িউলী, এবং যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক সামোভার নেই সেইজন্যে পালা করে খেতে হয়। কেউ যদি পালা পড়ার আগেই তার কেটলি নিয়ে এসে হাজির হয়, তাহলে গোটা দলটা ঝাঁপিয়ে পড়বে অপরাধীর ওপর। আমার কপালে তাই ঘটেছিল প্রথম বার... কিন্তু সেটা কিছু উল্লেখযোগ্য নয়! সেই উপলক্ষ্যে আমি সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠি। প্রথম পরিচয় হয় নৌবাহিনীর অফিসারের সঙ্গে। লোকটা বেশ আত্মবিশ্বাসী, বাপ, মা, বোন (তুলার এক অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে) এবং ক্রনশ্তাদ্‌ত্

শহর সম্পর্কে সমস্ত গল্প করে সে আমায় শুনিয়েছে। সে আমায় সবকিছু সাহায্য করবে বলে এবং সেই মুহূর্তে চায়ে নেমন্তন্ন করে বসে। যে ঘরখানায় গেলাম সেখানে তাস খেলার বিরাম নেই। চায়ের পর ওরা আমাকেও খেলায় যোগ দেবার জন্যে পেড়াপিড়ি করতে লাগল, রহস্য করে কিনা জানি না। সারা রাত ধরে ওরা খেলেছে এবং আমি যখন ঢুকলাম তখনো খেলে চলেছে ওরা। ফরফর করে তাস ভাঁজা চলছে, খসখস করে লেখা হচ্ছে খড়ি দিয়ে, তামাকের গন্ধে জায়গাটা ভর্তি। জুয়া খেলতে আমি আপত্তি করায় ওরা আমায় জানিয়ে দিলে, দর্শন কপচানো থামাও। অতঃপর আমার সঙ্গে কেউ একটি কথাও কইলে না। সত্যি কথা বলতে, তাতে আমি একটুও ক্ষুণ্ন হইনি। আর ওখানে আমি যাচ্ছি না। জুয়াড়ী, একেবারে জুয়াড়ী সব। লেখক ভদ্রলোকটিও তার ঘরে মাঝে মাঝে পার্টি দেন। কিন্তু সেখানকার বকিছুই বেশ নিরীহ ভদ্র, সূক্ষ্ম এবং উন্নত স্তরের।

এর সঙ্গে আরো একটি কথাও বলি ভারেঙ্কা, আমাদের বাড়িউলীটি হল একটি পাজি বুড়ি, আস্তো এক ডাইনী। তেরেসাকে তুমি তো দেখেছ, জানো কি রকম রোগা রোঁয়া-ওঠা মুরগীর ছানার মতো দেখতে।

চাকর বলতে আছে শুধু দুজন — তেরেসা আর ফালদোনি। ফালদোনির নাম হয়ত অন্য কিছু কিন্তু ফালদোনি বলে ডাকলেও লোকটা জবাব দেয়। তাই সকলেই তাকে ডাকে ফালদোনি বলে। লাল মাথা, বাঁকাচোরা চেহারা লোকটার, জাতে ফিন। বোঁচা নাক, রূঢ়ভাষী — তেরেসার সঙ্গে ঝগড়া লেগেই আছে, হাতাহাতি হবারও উপক্রম হয়। মোটের ওপর বলতেই হবে, জীবন এখানকার তেমন উপাদেয় নয়... কিছুতেই সকলে একসময়ে ঘুমতে যাবে না, কিছু লোক থাকবেই যারা তাস খেলবে। তাছাড়াও মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড হয়, যা বলতেও লজ্জা করে। আমার দিক থেকে এসব অবশ্য সহ্য হয়ে গেছে, কিন্তু ভেবে পাই না, পরিবার পরিজন নিয়ে যারা থাকে তারা এই পাগলাগারদে বাস করতে পারে কি করে? বারান্দার ওপাশকার ঘরখানায় একটি গরিব পরিবার থাকে — অন্যদের থেকে জায়গাটা একটু দূরে, আলাদা এক কোণে। নিরীহ লোক ওরা, চোখেই প্রায় পড়ে না, পার্টিশনের আড়ালে একটা ঘরে থাকে ভারি চুপচাপ। বাপের নাম গর্শ্‌কোভ, বেকার কেরানি একজন, সাত বছর আগে কি কারণে যেন চাকরি গেছে। বেঁটেখাটো, পাকাচুলো লোকটা — এমন ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক পরে

চলাফেরা করে যে তাকিয়ে দেখা যায় না। ওর ওয়েস্ট কোটটা এমন কি আমার চেয়েও বেশি দুরবস্থায়। ভারি বিষণ্ণ গোবেচারি একটি লোক। (মাঝে মাঝে করিডরে দেখা হয় আমাদের)। হাঁটু দুটো ওর নড়বড়ে, হাত আর মাথাও কাঁপে—কে জানে কি রোগ! ভীরু গোছের মানুষ, মুখচোরা, আপন মনে থাকে একলা একলা। আমাকে দেখেও মাঝে মাঝে মুখচোরা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ওর অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। বউ আছে লোকটার, আর তিনটে বাচ্চা। বড়ো ছেলেটা ঠিক বাপের মতোই দুবলা-পিনপিনে। এককালে রূপ ছিল বৌটার—এখনো দেখে বোঝা যায়। কিন্তু এমন ন্যাতাকানি পরে থাকে বেচারী। শুনেছি, ওদের ভাড়া বাকি পড়েছে। মোটের ওপর বাড়িউলী ওদের ওপর মোটেই সদয় নয়। শুনেছি গর্‌শ্‌কোভের নাকি চাকরি গিয়েছিল কি একটা বিপদে পড়ে—কিছু একটা মোকদ্দমা বা তদন্তের জন্যে—ঠিক জানি না ব্যাপারটা। কিন্তু ভারি গরিব ওরা, ঈশ্বর, কি অসম্ভব গরিব! ওদের ঘর থেকে কখনো কোনো শব্দ শোনা যাবে না, মনে হবে যেন লোকই থাকে না বাড়িতে। ছেলেগুলোর পর্যন্ত কোনো চ্যাঁচামেচি নেই। কখনো

খেলাধূলো করতে ওদের দেখিনি। ভারি খারাপ লক্ষণ। বাড়িটা সে দিন সন্ধ্যেয় ছিল খুব অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ। ওদের ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় একদিন কানে এল ফোঁপানির একটু শব্দ, তারপর একটু ফিসফাস, ফের ফোঁপানি। বোধ হয় কেউ কাঁদছিল কিন্তু এমন চাপা গলায় এমন করুণভাবে যে বুকটা আমার ভেঙে যাচ্ছিল। সারা রাতই ওদের কথা ভেবেছি, ঘুমোতে পারিনি।

যাই হোক, বিদায় আমার ভারেঙ্কা, আমার অমূল্য ছোট্টো মেয়েটি! যথাসাধ্য বর্ণনা করে সবই জানালাম। সারা দিন শুধু তোমার কথাই মনে হয়েছে আজ। তোমাকে নিয়ে এমন ভাবনা লাগছে। জানি, তোমার গরম কোট নেই। পিটার্সবুর্গের এই বসন্ত—এই বাতাস আর বৃষ্টি আর তুষারপাত ভরা এই বসন্ত আমার সয় না। এই বসন্তই হবে আমাদের মরণ, ভারেঙ্কা! বিগলিত এই ঋতু থেকে ঈশ্বর আমাদের বাঁচান। আমার লেখার ধরণ দেখে রাগ কোরো না, স্টাইল ফাইল কিছুই আমার নেই। থাকলে ভালো হত। যা মনে আসে তাই লিখে শুধু তোমাকে একটু আনন্দ দিতে চাই। ভালো মতো যদি কিছু শিক্ষাদীক্ষা থাকত জীবনে,

তাহলে অবিশ্যি অন্য রকম হত। কিন্তু কি শিক্ষাই না আমার জুটেছে—এক কাণাকড়িও দাম নয় তার!

তোমার চিরবিশ্বস্ত সুহৃদ,

মাকার দেভুশ্‌কিন

২৫শে এপ্রিল

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

আজ দেখা হল খুড়তুতো বোন সাশার সঙ্গে। মাগো! মেয়েটা চুলোয় যেতে বসেছে। এও শুনছি যে আন্না ফিওদরভ্‌না নাকি আমার খোঁজখবর করছেন। আমাকে কি কখনো রেহাই দেবেন না উনি? যা হয়েছে, হয়েছে, এখন আমাকে নাকি উনি ক্ষমা করতে চান, শীগগিরই নাকি আমার বাড়িতে নিজে আসবেন। ওঁর বক্তব্য, তুমি আমার আত্মীয় নও, উনি আমার বেশি আপন, আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানোর কোনো অধিকার তোমার নেই। তোমার দান আর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বাঁচা নাকি আমার পক্ষে লজ্জার কথা। আমাকে গালাগালি দিচ্ছেন অকৃতজ্ঞ

বলে। উনি বলছেন আমি নাকি তাঁর আতিথেয়তার কথা ভুলে গেছি, অনশন থেকে মাকে আর আমাকে নাকি উনিই বাঁচিয়েছেন, আমাদের খাওয়াতে গিয়ে আড়াই বছর ধরে ওঁর ঢের খরচা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের ঋণ মার্জনা করতে খুব প্রস্তুত। আমার বেচারী মাকে পর্যন্ত উনি রেহাই দিতে রাজী নন। ওরা যে আমার কি করেছে, তা যদি মা জানতেন! কিন্তু ভগবান সবই দেখছেন!... আন্না ফিওদরভ্না বলেন, আমার দুঃখের জন্যে আমিই দায়ী, উনি আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি যদি আমার সুনাম না বাঁচাতে পারি বা না বাঁচাতে চাই, তবে দোষ তাঁর নয়। তাহলে কার দোষ, হায় ভগবান! উনি বলেন বীকভ ঠিক কাজই করেছেন, কে বিয়ে করবে সেই মেয়েকে, যে... কিন্তু কি লাভ এ সব লিখে! এ রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করা কঠিন, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্! আমার কি হয়েছে জানি না। বসে বসে কাঁপছি, কাঁদছি, চোখের জল ফেলছি। দু'ঘণ্টা লেগেছে এই চিঠি লিখতে। খুব আশা করেছিলাম, উনি শেষ পর্যন্ত হয়ত বুঝবেন এবং স্বীকার করবেন যে উনি অন্যায় করেছিলেন। কিন্তু কি আর বলি! যাই হোক, তুমিই

আমার একমাত্র হিতৈষী, আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। ফেদোরা সবসময়েই একটু বাড়িয়ে বলে। আমার অসুখ করেনি। কাল ভোল্কভো কবরখানায় মায়ের স্মৃতি উপাসনায় গিয়ে অল্প একটু ঠাণ্ডা লেগেছে মাত্র। কিন্তু আমার সঙ্গে কেন এলে না তুমি, কত করে বললাম! আহা, আমার বেচারী মা, কবর থেকে উঠে একবার যদি এসে দেখে যেতে, কি ওরা আমায় করেছে!...

ভ. দ.

২০শে মে

ভারেঙ্কা, লক্ষ্মীটি আমার!

কিছু আঙুর পাঠাচ্ছি, অসুখ থেকে ওঠার পর আঙুর খুব কাজে দেয়। ডাক্তাররাও বলে, তেষ্টা লাগলে আঙুর খাওয়া ভালো। সেইজন্যেই পাঠালাম, পাছে তেষ্টা লাগে, শুধু এই জন্যে। কাল কিছু ক্রুলার ফুল চেয়েছিলে, তাই ক্রুলারও কিছু পাঠালাম। ক্ষিদে হচ্ছে কেমন? ঐটে হল আসল কথা। যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ব্যাপারটা মিটে গেল, কষ্টের দিন শেষ হয়ে আসছে আমাদের। সেজন্যে ওপর-আলাকে নমস্কার করি,

এসো। আর ঐ বইগুলো এখনো ঠিক জোগাড় করে উঠতে পারিনি। এরা বলছে যে এখানে নাকি একটা ভালো বই আছে, ভারি চমৎকার করে লেখা। বলছে খুবই ভালো বই। আমি নিজে পড়িনি, কিন্তু সকলেই খুব প্রশংসা করছে, আমাকে ধার দেবে কথাও দিয়েছে, কিন্তু তুমি পড়বে কি? তুমি এত খুঁতখুঁতে—তোমার রুচিতে মেলা কঠিন। সে কথা আমি ভালোই জানি। কবিত্বময় কিছু বোধ হয় তোমার পছন্দ, ভালোবাসা আর বেদনায় ভরা এমন কিছু। ভয় নেই, কবিতা-টবিতার বইও জোগাড় করে দেব। এদের কাছে একটা নোটবইও আছে, তাতে কবিতা টুকে টুকে রেখেছি।

আর আমি? আমি বেশ ভালোই আছি। তাই লক্ষ্মীটি, মোটেই ভাবনা কোরো না। ফেদোরা যা বলে তাতে মোটেই কান দেবে না। ওকে বলে দিয়ো, ও হল একটি গুজবপ্রিয় বুড়ি।... বলে দিয়ো কিন্তু। আমি আমার নতুন আপিসের পোষাকটা মোটেই বিক্রি করিনি। কেনই বা করতে যাব, কি প্রয়োজন? শুনেছি, চল্লিশ রুবল বাড়তি মাইনে আমার শীগগিরই পাবার কথা। সে ক্ষেত্রে জামা বিক্রি করতে যাব কেন? সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নেই। ফেদোরা হল ভারি ব্যস্তবাগীশ,

এত ব্যস্তবাগীশ আর নার্ভাস্। সুখের দিন এল বলে! শুধু তুমি যদি একটু ভালো হয়ে ওঠো, আমার রাণী। ঈশ্বরের দোহাই, সুস্থ হয়ে ওঠো, বুড়ো মানুষটাকে নিরাশ কোরো না। কে তোমায় বললে যে আমি রোগা হয়ে গেছি? ফের যত গুজব! একদম বাজে রটনা! যথাসম্ভব সুস্থ আমি, এমন মোটা হয়ে গেছি যে নিজেরই লজ্জা করছে—সংক্ষেপে, অতি আরামে আছি আমি। কেবল তুমি ভালো হয়ে ওঠো। এবার আসি, আমার আদরের দেবী, একটি একটি করে তোমার ছোটো ছোটো সবকটি আঙুলগুলোতে আমার চুমু রইল।

চিরকালের জন্যে তোমার চিরন্তন সুহৃদ,

মাকার দেভুশ্‌কিন

পুঃ কিন্তু ওটা কি কথা লিখেছ? সত্যি একটু বিচার করে দেখো! অত ঘন ঘন তোমায় দেখতে যাওয়া কেমন করে সম্ভব? কি করে তা পারি? অন্ধকারের আড়াল ছাড়াই যাব নিশ্চয় আশা করো না। নয় কি? কিন্তু এই ঋতুটায় রাতে অন্ধকার থাকেই বা কতোটুকু? তাছাড়া তোমার অসুখ যখন বেড়েছিল, জ্ঞান ছিল না তখন তোমার বিছানা ছেড়ে আমি প্রায়

নড়িনি। জানি না কি করে তা পেরেছিলাম। লোকের কথায় ও গুজবের ভয়ে আসা যাওয়া বন্ধ করতে হল। তবুও কত কি রটতে শুরু করেছে। তেরেসার ওপর অবশ্য আমার পুরো বিশ্বাস আছে—কথা বলে বেড়ানো ওর স্বভাব নয়। কিন্তু ভাবো তো, লোকে যদি আমাদের সম্পর্কে সব কিছু টের পেয়ে যায়, কি হবে তাহলে? কি না ভাববে তারা, কি না বলে বেড়াবে! ধৈর্য ধরে থাকো, লক্ষ্মীটি, সেরে ওঠা পর্যন্ত সবুর করো। তখন আড্ডা দেব আমরা।

১লা জুন

শ্রদ্ধাস্পদেষু মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এমন একটা কিছু করি যা তোমার ভালো লাগবে, তোমার কাছ থেকে যে স্নেহ ও সাহায্য পেয়েছি তার জন্যে তোমাকে কিছু আনন্দ দেবো। এই ভেবে আমার দেরাজ ঘাঁটাঘাঁটি করে এই পুরনো খাতাখানা পেয়েছি; তোমায় সেটা পাঠালাম। লিখতে শুরু করেছিলাম আমার সুখের দিনগুলোয়। সেই থেকে মাঝে মাঝে বাদ পড়লেও চালিয়ে গেছি। প্রায়ই তুমি কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করেছ আমার

অতীতের কথা, আমার মা, পক্রোভ্স্কি, আন্না ফিওদরভ্‌নার সঙ্গে আমার জীবন, এবং পরিশেষে আমার সাম্প্রতিক বিপদের কথা। এই লেখাগুলো পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল তোমার। কি ভেবে যেন ওতে আমি অতীতের নানা ঘটনা লিখে রেখেছিলাম, এগুলো পড়ে তুমি আনন্দ পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার কথা যদি বলো, ওগুলো পড়লে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। এর শেষ লাইনগুলো যখন লিখেছিলাম, তখন আমার যা বয়স মনে হয় আমি বুঝি তার দুগুণ বড়ো। বিদায় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, এত ক্লান্ত আর নিঃসঙ্গ লাগছে, কিছুতেই ঘুম আসে না। অসুখ থেকে সেরে ওঠার এই সময়টা কি অসহ্য।

ভ.দ.

১

বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স চোদ্দ। ভারি সুখের ছিল আমার ছেলেবেলা। ত... প্রদেশের কুমার বাহাদুর প... এর বিরাট জমিদারিতে বাবা ছিলেন গোমস্তা। কুমার বাহাদুরের এলাকাধীন একটি গ্রামে,

এখান থেকে অনেক অনেক দূরে আমাদের জীবন কাটত সুখে, শান্তিতে, সকলের অগোচরে। আমি ছিলাম চঞ্চল প্রকৃতির, মাঠঘাট, বন আর বাগিচায় ছুটে বেড়াতাম সবসময়। জমিদারির কাজ নিয়ে বাবা থাকতেন সারাক্ষণ ব্যস্ত আর মা থাকতেন ঘর-সংসার নিয়ে, তাই আমি ছিলাম নিজের মতো। শিক্ষা দেবার মতো কেউ ছিল না, তাতে কোনো দুঃখ ছিল না আমার। সকাল হলেই আমি ছুটতাম পুকুরপারে, নয়ত বনের ধারে, নয়ত যারা ফসল কাটছে কি খড় গাদি করছে তাদের কাছে। কখনো কেয়ার করিনি, রোদ্দুরে গা পুড়ছে কি না, বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি কি না, অথবা ঝোপঝাড়ে লেগে মুখ হাত পা কেটে ছড়ে গেছে কি পোষাক ছিঁড়ে গেছে কি না। এর জন্যে পরে বাড়িতে বকুনি খেলেও কিছু এসে যেত না।

সারা জীবন আমার যদি এই গাঁয়েই কাটত, তাহলে দুঃখ ছিল না। কিন্তু ভাগ্যের নির্বন্ধ ছিল অন্য রকম। তখনো আমি ছেলেমানুষ, বারো বছর বয়স—সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চলে এলাম আমরা। যাবার জন্যে যখন তৈরি হচ্ছিলাম, তখনকার কথা ভাবলে এখনো আমার কষ্ট হয়—আমার যত কিছু প্রিয় বস্তু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে

গিয়ে কি কান্নাই না কেঁদেছিলাম, বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কত মিনতি করেছিলাম, আরো কিছু দিন থেকে যেতে। বাবা বিরক্ত হয়ে বকুনি দিয়েছিলেন আমায়। মা কাঁদছিলেন। বললেন, বাবার জন্যে যেতেই হবে। বুড়ো কুমার বাহাদুর প... মারা গিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা বাবাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কিছু লোকের কাছে বাবা কিছু টাকা ঢেলেছিলেন। ভাবলেন, সেখানে যেতে পারলে আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে। এ কথা মা আমাকে বলেছিলেন পরে। রাজধানীতে এসে আমরা বাসা নিলাম পিটার্সবুর্গ স্তরোনায়—বাবার মৃত্যু পর্যন্ত সেইখানেই আমরা ছিলাম।

নতুন জীবনে অভ্যস্ত হতে কি কষ্টই না গেছে! শহরে এসে পেঁৗছেছিলাম আমরা শরতে। কিন্তু গাঁ ছেড়েছিলাম ঝকমকে রোদ-ভরা এক দিনে—সবকিছুই তখনো বেশ গরম আর উচ্ছল। ক্ষেতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গোলা-বাড়িগুলো শস্যে ভরতি, মাথার ওপর কিচির-মিচির করে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখিরা। সবকিছুই ভারি হাসিখুশি ঝকঝকে। কিন্তু শহরে যখন এসে পেঁৗছলাম তখন সেখানে কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি, গোমড়া আকাশের নিচে কেবল শরতের ঝাপট আর

নিষ্প্রভ হিম। দলে দলে কেবল অজানা অচেনা লোক—কেমন পর পর, রুষ্ট আর বিমর্ষ। নতুন ঘর গুছোনোর যথারীতি দুর্ভাবনা আর প্রচুর কোলাহলের পর আমরা সংসার পেতে বসলাম। বাবা বাড়িতে প্রায় থাকতেনই না, আর মা থাকতেন সারাক্ষণই ব্যস্ত। আমার কথা কেউই ভাবত না। ওখানে যাবার পরদিন সকাল বেলাটা—ওঃ, কি বিচ্ছিরই না লেগেছিল। আমাদের জানলার সামনেই একটা হলদে বেড়া, আর নিচে কাদা-ভরা রাস্তা—সে কাদা কখনই শুকুত না। রাস্তায় লোক চলাফেরা করত খুব কম—বাতাসের ভয়ে সকলেই আপাদমস্তক কোটে ঢাকা।

আমাদের বাসাটা ছিল ভারি নিরানন্দ, একঘেয়ে। আত্মীয় বন্ধু ছিল না বললেই হয়। আন্না ফিওদরভ্‌নার সঙ্গে বাবার কথাবার্তা ছিল বন্ধ (ওনার কাছে বাবা কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন)। প্রায় যারা আসত তারা হল বাবার কারবারের সহযোগী — প্রায়ই এসে ঝগড়াঝাঁটি তর্কবিতর্ক করে চেঁচামেচি লাগাত। তারা চলে যাবার পরে প্রতিবারই দেখা যেত বাবার মন খারাপ, মেজাজ বিগড়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি তখন নিঃশব্দে পায়চারি করতেন ঘরময়। ভয়ে কোনো

কথা বেরুত না মার মুখ দিয়ে। ইঁদুরের মতো চুপটি করে আমিও এক কোণে গিয়ে বসে থাকতাম বই নিয়ে।

পিটার্সবুর্গে আসার তিন মাস পরে আমাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হল—অপরিচিত লোকজনের মধ্যে কি কষ্টেই না দিনগুলো কেটেছে! সকলেই সেখানে ভারি বিরূপ—সবসময়েই শিক্ষয়িত্রীদের ধমক; আর মেয়েরা মজা করত আমাকে নিয়ে, নিজেকে সবসময়েই লাগত কেমন বেমানান। সবকিছুই ছিল কড়া শাসনে, পান থেকে চূণ খসবার জো নেই! সবকিছুই চলত ঘণ্টা ধরে, একসঙ্গে বসে খাওয়ার জন্যেও বটে, আর একঘেয়ে পড়ানোর জন্যেও বটে। এমন হতাশ আর মনমরা লাগত! প্রথম প্রথম ঘুমোতে পর্যন্ত পারতাম না—সারা রাত কাঁদতাম শুয়ে শুয়ে। ওহ, সেই ঠাণ্ডা একঘেয়ে রাতগুলো যেন শেষই হত না! সন্ধ্যে বেলায় পড়া করতে বসে নড়তে চড়তে পর্যন্ত ভয় হত; ক্রিয়াপদ আর বাক্য-গঠনের পাঠ সামনে নিয়ে মন চলে যেত ঘরের পানে, ভাবতাম মা বাবার কথা, আমার বুড়ি ধাই-মায়ের কথা, তার বলা রূপকথাগুলোর কথা—আর কষ্ট হত অসহ্য! বাড়ির ছোটোখাটো জিনিসগুলোর কথা ভেবেও আনন্দ হত। ইচ্ছে হত, কেবলি ইচ্ছে হত চলে যাই সেখানে,

আমাদের সেই ছোটো ঘরখানায় গিয়ে বসি—সামোভার ফুটছে, চেনা মুখ সব চারপাশে, আর সবকিছুই কেমন ঘনিষ্ঠ, ঘরোয়া, গরম। মাকে নিয়ে কি টানাটানিই না করতাম তাহলে, সবেগে জড়িয়ে ধরতাম। বসে ভাবতে ভাবতে কাঁদতাম লুকিয়ে লুকিয়ে, বুকের মধ্যে ফোঁপানি নিয়ে বেমালুম ভুলে যেতাম সমস্ত পড়া। তারপর সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখতাম মাস্টারদের, প্রধান শিক্ষিকার, মেয়েগুলোর—কল্পনা করতাম আমি যেন পড়া মুখস্থ করছি, কিন্তু সকাল বেলায় আবার যে কে সেই। শাস্তি হিসেবে ওরা আমায় হাঁটু গেড়ে দাঁড় করিয়ে রাখত—খাওয়ার সময় দিত শুধু একটি পদ। সারাক্ষণ মন খারাপ হয়ে থাকত আমার। প্রথম প্রথম মেয়েগুলো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত, পেছনে লাগত আমার, মাস্টারদের প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় ইচ্ছে করে আমাকে ঘাবড়ে দিত; দুজন দুজন করে লাইন দিয়ে চা কি খাবার খেতে যাবার সময় চিমটি কাটত আমাকে, তারপর এতটুকু ছুতো পেলেই প্রধান শিক্ষিকার কাছে গিয়ে নালিশ করে আসত। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যে বেলা যখন আমার ধাই-মা আসত—আহ্, কি অদ্ভুতই না লাগত তখন। পাগলার মতো জড়িয়ে ধরে চুমু খেতাম তাকে।

আমাকে ভালো করে ঢাকাঢুকি দিয়ে নিত সে—তারপর সোজা ঘরমুখো রওনা, আমার হাঁটার সঙ্গে ধাই-মা তাল রেখে উঠতে পারত না। বাড়ি পৌঁছবার আগে পর্যন্ত এটা সেটা বকেই চলতাম আমি—বাড়ি পৌঁছনো মাত্র মন হালকা হয়ে হাসিখুশি হয়ে উঠতাম—সকলকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চুমু খেতাম যেন বছর দশেক পরে দেখা! কি সোরগোল পড়ে যেত তখন, কতো কথা, কতো গল্প। সকলের কাছেই ছুটে যেতাম অভিনন্দন জানাতে। হেসে চেঁচামেচি করে লাফিয়ে বেড়াতাম। তারপর বাবার সঙ্গে শুরু হত আমার পড়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা—পড়া সম্পর্কে, শিক্ষকদের সম্পর্কে, ফরাসী ভাষা আর লোমন্দের ব্যাকরণ সম্পর্কে—আর সকলেই খুশিতে তৃপ্তিতে ভরে উঠত। সে সব কথা মনে পড়লে আজো পর্যন্ত আনন্দে হাসি আসে। বাবার কথা ভেবে আমি যথাসাধ্য ভালোভাবে পড়ার চেষ্টা করতাম—দেখতাম আমার জন্যে তিনি তাঁর শেষ কপর্দকও ব্যয় করছেন, ঈশ্বর জানেন কি করে তিনি সামাল দিচ্ছিলেন। দিন দিন তিনি বিষণ্ন আর অপ্রসন্ন আর খিটখিটে হয়ে উঠছিলেন। ওঁর সঙ্গে চলা কঠিন হয়ে উঠছিল। ব্যবসা ওঁর দিনকে দিন খারাপের দিকে

যাচ্ছিল, দেনায় ডুবে যাচ্ছিলেন। ভয়ে মা না পারতেন কাঁদতে না কিছু বলতে—হট্ করে চটে উঠতেন তিনি। রুগ্ন হয়ে যেতে লাগলেন মা, দেহ ক্ষীণ হয়ে গেল, বিছছিরি একটা কাশি ধরল ওঁর। ইস্কুল থেকে ফিরে দেখতাম সকলেই কেমন বিমর্ষ। বাবা রেগে আছেন আর লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে মায়ের চোখ দুটো রাঙা রাঙা। বকুনি ভর্ৎসনার বিরাম ছিল না। বাবা বলতেন, আমি তাঁকে কোনো আনন্দ, কোনো সান্ত্বনা দিতে পারছি না। আমার শিক্ষার জন্যে তিনি তাঁর শেষ পয়সাটুকুও ঢেলেছেন অথচ ফরাসী বলাও আমি শিখতে পারিনি। মোটের ওপর যত কিছু অসাফল্য আর দুর্ভাগ্য তার জন্যে দোষ ধরা হত মায়ের আর আমার। মাকে কি ভাবেই না জ্বালাতেন উনি! মায়ের মূর্তি দেখলেই বুক মোচড় দিয়ে উঠত আমার। গাল বসা, চোখ গর্তে—অদ্ভুত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর আমার হত সবচেয়ে দুর্ভাগ্য। তুচ্ছ কিছু একটা নিয়ে শুরু হত আর কোথায় যে গড়াত ঈশ্বর জানেন। মাঝে মাঝে ভেবেই পেতাম না, ব্যাপারটা কি নিয়ে। সবকিছুই যেন আমার অপরাধ—আমার ফরাসী-জ্ঞান স্বল্প, আমি মাথা মোটা, প্রধান শিক্ষিকা হলেন একটি নির্বোধ—তিনি কর্তব্যে

অবহেলা করেন এবং আমাদের নীতি-শিক্ষা সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, বাবা নিজে এখনো কোনো কাজ জোটাতে পারেননি, লোমন্দের ব্যাকরণটি হল একটি বাজে বই, জাপোল্‌স্কির বইয়ের চেয়ে অনেক খারাপ, এক গাদা টাকায় আমার জন্যে ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে, আমার বিকার নেই অনুভূতি নেই—এ সবই হল আমার অপরাধ। মোট কথা, ক্রিয়াপদ আর বাক্যগঠন নিয়ে যতই মেহনত করি না কেন, সবকিছুর জন্যেই আমি দোষী। আমার বাবা যে আমায় ভালোবাসতেন না তা নয়। বরং উল্টো। মা আর আমায় তিনি পাগলের মতো ভালোবাসতেন। কিন্তু ঐ হল তাঁর স্বভাব।

দুশ্চিন্তায়, বিফলতায় বাবা ভারি মেজাজী আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। প্রায় হতাশার চরমে নেমে যেতেন তিনি, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতেন না, ফলে ঠাণ্ডা লেগে অল্প একটু অসুখেই এমন হঠাৎ মারা গেলেন যে বেশ কয়েক দিন ধরে আমরা হতভম্ব হয়ে রইলাম। বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে উনি নেই। মা এমন নিঝুম হয়ে গেলেন যে তাঁর জন্যেই ভয় হতে লাগল। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে এসে একত্রে ছেঁকে ধরল তাঁর পাওনাদাররা। যা কিছু ছিল,

সব ছেড়ে দিতে হল। আমাদের আসার মাস ছয়েক পরে পিটার্সবুর্গ স্তরোনায় বাবা যে ছোট্ট বাড়িখানা কিনেছিলেন, সেটাও বিক্রি করে দিতে হল। শেষ পর্যন্ত কি করে সব রফা-নিষ্পত্তি হল জানা নেই, শুধু দেখা গেল, আমাদের না রইল বাড়ি, না একটা আশ্রয়, না কোনো উপায়। কঠিন অসুখে মা ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন: না ছিল খাদ্য, না কোনো সঞ্চয়, না কোনো আশা। আমার বয়স তখন চোদ্দ, আন্না ফিওদরভ্না সেই সময় প্রথম আমাদের দেখতে আসেন। উনি বার বার করে বোঝালেন যে উনি এক রকমের জমিদার এবং আমাদের আত্মীয়। মাও বললেন, উনি আত্মীয় হন, তবে খুব দূর সম্পর্কের। বাবা বেঁচে থাকার সময় উনি কখনো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। এখন এলেন চোখে জল নিয়ে, বললেন আমাদের ভাগ্য দেখে তিনি ভাবিত হয়েছেন। শোক এবং দুরবস্থায় সহানুভূতি জানালেন। এ কথাও তিনি অবশ্য জানিয়ে দিলেন যে বাবা সাধ্যের বাইরে খরচা করতেন, একটু বেশি উঁচুতে উঠেছিলেন, এবং নিজের ওপর ভরসা করেছিলেন একটু বেশি মাত্রায়।

বললেন যে আমাদের সঙ্গে উনি সম্পর্ক ভালো রাখতে চান, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। মা যখন

বললেন, তাঁর মনে কখনো কোনো বিরূপতা ছিল না, তখন উনি কেঁদে ফেললেন। তারপর মাকে নিয়ে গেলেন গির্জায় এবং মৃত প্রিয়জনের (আমার বাবার) আত্মার জন্যে 'মাস' উপাসনার বায়না দিলেন। এই ভাবে মায়ের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক মিলমিশ হয়ে গেল।

নানা রকম ভূমিকা করে আমাদের দুরবস্থা, আমাদের সহায় সম্বলহীন নিরুপায় অবস্থার কথা বেশ ফলাও করে জানিয়ে দিয়ে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর গরিব সংসারে আশ্রয় নিতে। গরিব সংসার কথাটা তাঁরই উক্তি। মা ধন্যবাদ জানালেন বটে, তবু দীর্ঘ দিনের মধ্যেও মন স্থির করে উঠতে পারেননি। কিন্তু যেহেতু আর কোনো উপায় ছিল না, আর কিছু করবার ছিল না, তাই পরিশেষে তিনি আন্না ফিওদরভ্‌নাকে জানালেন, তাঁর আমন্ত্রণ আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করছি। স্পষ্ট মনে পড়ে সেই সকালটা, যেদিন আমরা পিটার্সবুর্গ স্তরোনা থেকে উঠে গেলাম ভাসিলিয়েভ্‌স্কি ওস্ত্রভে। ঝকঝকে ঝরঝরে ঠাণ্ডা শরতের সকাল — মা কাঁদছিলেন, আমিও মনমরা। অস্পষ্ট অশুভ নানা আশঙ্কায় বুকটা ভারি... ভারি কষ্টের দিন গেছে সে সময়...

২

ষষ্ঠ পঙক্তিতে নিজের বাড়িতে বাস করতেন আন্না ফিওদরভ্না। ওখানে জীবনটা ছিল অদ্ভুত আর ভয়াবহ, পরে অবশ্য তা আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। বাসের ঘর ছিল পাঁচটি—তিনটি ছিল আন্না ফিওদরভ্না এবং আমার পিসতুতো বোন সাশার জন্যে—অনাথা মেয়ে সাশাকে উনি পুষ্যি নিয়েছিলেন। চতুর্থ ঘরখানা পেলাম মা আর আমি। পঞ্চম ঘরখানায় ভাড়া থাকত পক্রোভ্‌স্কি নামে একটি গরিব ছাত্র। প্রথম দেখে যা মনে হয়, আন্না ফিওদরভ্না আসলে তার চেয়ে বেশী পয়সাওয়ালা। কিন্তু সে উপার্জনের উৎসটা তাঁর ক্রিয়াকলাপের মতোই রহস্যময় থেকে গিয়েছিল। বিশ্রাম নিতেন না কখনো, সবসময়ই উনি ব্যস্তসমস্ত, দিনে বার কয়েক করে বাইরে ঘুরে আসতেন। কিন্তু ঠিক কি নিয়ে উনি অমন ব্যস্ত তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। অসংখ্য এবং বিচিত্র তাঁর বন্ধুবান্ধবের আসা যাওয়ার বিরাম ছিল না। ঈশ্বর জানেন কে তারা—অনবরত আসত কোনো একটা কাজে, থাকত মিনিট খানেক করে। দরজার ঘণ্টা বাজলেই মা আমাকে ঘরের

মধ্যে ডেকে নিয়ে যেতেন এবং এতে আন্না ফিওদরভ্‌না ভয়ানক চটে যেতেন। মার ওপর চোটপাট করতেন, বলতেন আমরা ভারি অহঙ্কারী, অত অহঙ্কার আমাদের পোষায় না—অহঙ্কারের কি আছে আমাদের! এমনি চোটপাট চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁর তিরস্কারের তাৎপর্য তখনো আমি বুঝিনি। এখন বুঝতে পারি, আন্না ফিওদরভ্‌নার ওখানে যেতে মার অত অনিচ্ছা ছিল কেন। বদমেজাজী মেয়ে ছিলেন উনি। অনবরত আমাদের জ্বালাতেন। আদৌ কেন যে আমাদের থাকবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিলেন, তা এখনো আমার কাছে রহস্য। প্রথম দিকে খানিকটা নরমই ছিলেন তিনি, কিন্তু দুদিন না যেতেই যখন দেখলেন আমরা সত্যিই অসহায়, একান্তই কোথাও যাবার জায়গা আমাদের নেই, তখন তাঁর আসল মূর্তি প্রকাশ পেল। পরে ফের তিনি আমার ওপর সদয় হয়ে উঠেছিলেন—এমন কি তোষামোদ আর ঘনিষ্ঠতা পর্যন্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে আমাকেও মায়ের চেয়ে কম কিছু সইতে হয়নি। বার বার করে তিনি তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের কথা আমাদের মনে করিয়ে দিতেন—এ ছাড়া যেন আর কিছুই তাঁর বলবার ছিল না। অপরিচিত আগন্তুকদের

কাছে তিনি আমাদের পরিচয় দিতেন গরিব দুঃখী আত্মীয় বলে — খ্রীষ্টানসুলভ করুণায় আমাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। খাবার সময় কড়া নজর করে দেখতেন ক'গ্রাস আমরা মুখে তুলছি, কিন্তু যদি অল্প খেতাম, তাহলেও আবার এক কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন: আমরা নাকি ভারি সৌখীন, তাঁর বাড়ির খাওয়া নাকি আমাদের মুখে রুচছে না, কিন্তু এর চেয়ে ভালো খাবার খেয়েছি কখনো আমরা? বাবাকে গাল পাড়া তাঁর শেষ হত না কখনো; বলতেন, যেমন সকলের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকতে গিয়েছিলেন, তেমনি দুরবস্থায় পড়েছেন, সংসারটাকে ভিখিরি করে ছেড়েছেন, ভাগ্যিস একজন দয়ালু আত্মীয় ছিল — একজন সদয় খ্রীষ্টান — নইলে, হয়ত না খেয়ে মরতে হত রাস্তায়। কি না বলতেন উনি! সে সব কথা শুনে কষ্ট যত না হত, তার চেয়েও বেশি হত বিতৃষ্ণা। মা প্রায়ই কেঁদে ফেলতেন, দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করল: স্পষ্টতই তিনি ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমরা সকাল থেকে রাত অবধি কাজ করে যেতাম — সে কাজ ছিল প্রধানত ফরমাশ মতো সেলাইয়ের কাজ। এতেও আন্না ফিওদরভ্না অসন্তুষ্ট হতেন, বলতেন তাঁর বাড়িখানা ফ্যাশনের

দোকান নয়। কিন্তু কাজ আমাদের করতেই হত জামাকাপড় এবং আচমকা কোনো খরচার পয়সা জোটাবার জন্যে। আমাদের নিজেদের বলতে কিছু টাকা হাতে রাখা খুবই দরকার। তাছাড়া টাকা জমাচ্ছিলাম এই আশায় যে অন্য কোথাও সরে যাব। কিন্তু মায়ের স্বাস্থ্যের যেটুকু বাকি ছিল কাজ করতে গিয়ে তাও শেষ হয়ে গেল। দিন দিন তিনি দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। অসুখে তাঁর জীবনীশক্তি শূন্য হতে শুরু করল। মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি, আর আমি সবই বুঝতাম, সবই দেখতাম, সবই সহ্য করতাম।

আমরা থাকতাম খুব চুপচাপ, যেন গাঁয়ের বাড়িতে আছি। আন্না ফিওদরভ্না যখন দেখলেন, আমাদের ওপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন ক্রমে তিনিও একটু শান্ত হয়ে এলেন। তাঁর বিরুদ্ধতা করার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। তাঁর মহল থেকে আমাদের ঘরখানা আলাদা ছিল, মাঝখানে একখানা বারান্দা। পাশের ঘরখানা ছিল পক্রোভ্স্কির—সে তো আগেই বলেছি। ফরাসী আর জার্মান ভাষা, এবং ইতিহাস ও ভূগোল—অর্থাৎ আন্না ফিওদরভ্নার উক্তি মতো, সর্ব বিদ্যায় সাশাকে শিক্ষা দেবার পরিবর্তে

ছেলেটি বিনামূল্যে থাকা খাওয়া পেত। সাশার বয়স তখন তেরো, সেয়ানা বুদ্ধি, যদিও খানিকটা বেয়াড়া গোছের। আন্না ফিওদরভ্না একবার বলেছিলেন, ইস্কুলে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি, সাশার সঙ্গে আমিও যদি পড়ি তাতে ক্ষতি হবে না — সে কথায় মা সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। সাশার সঙ্গে আমিও জুটে গেলাম এবং বছর খানেক পক্রোভ্স্কি আমাদের দুজনকেই পড়াল।

পক্রোভ্স্কি ছিল গরিব, খুবই গরিব একটি তরুণ। স্বাস্থ্য খারাপ বলে রেগুলার কোর্সে যোগ দিতে পারেনি, তবু যে তাকে ছাত্র বলা হত সে শুধু অভ্যেসের বশে। এত বিনীত আর এত চুপচাপ থাকত ও, যে তার ঘর থেকে কখনো কোনো শব্দ আমরা শুনতে পেতাম না। দেখতেও ছিল অদ্ভুত — হাঁটত বিদঘুটেভাবে, নমস্কার করত আনাড়ীর মতো, কথা বলত এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে যে প্রথম প্রথম হাসি চেপে রাখা কঠিন হত। সাশা সবসময়েই ওর পেছনে লাগত, বিশেষ করে পড়ার সময়। দুর্ভাগ্যবশত, লোকটা ছিল খিটখিটে স্বভাবের — একটুতেই রেগে কাঁই হয়ে যেত। চিৎকার করে, নালিশ করে, পড়া শেষ হবার আগেই ছুটে বেরিয়ে

যেত প্রায়ই। তারপর দিনকতক একলা একলা বসে থাকত তার নিজস্ব বইগুলোয় মুখ গুঁজে। বই ছিল ওর অনেক—সবগুলিই খুব দুর্লভ আর দামী। অন্য কিছু জায়গায় পড়িয়েও মাঝে মাঝে কিছু টাকা রোজগার করত সে। টাকা হাতে পেলেই গিয়ে কিনে আনত আরো বই।

পরে যখন ওকে আরো ভালোভাবে চিনতে পারলাম, দেখলাম লোকটা ভারি চমৎকার মানুষ—যত লোক দেখেছি সবচাইতে ভালো। মা ওকে খুব সম্মান করতেন, পরে মায়ের পর ও-ই হয়ে উঠেছিল আমার সবচেয়ে বড়ো সহায়।

কিন্তু প্রথম প্রথম সাশার সঙ্গে আমিও ওর পেছনে লাগতাম যদিও আমি তখন বয়সে বেশ বড়ো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবে ভেবে ওকে খুঁচিয়ে রাগিয়ে দেবার নতুন নতুন ফন্দি বার করতাম আমরা। রাগলে ওকে ভারি বিদঘুটে দেখাত, আর কি মজাই না লাগত আমাদের! (এখন সে সব কথা ভাবলে লজ্জা পাই)। একবার আমরা ওকে প্রায় কাঁদিয়ে ছেড়েছিলাম। শুনলাম ও বিড়বিড় করে বলছে, 'উঃ কি নিষ্ঠুর এই বাচ্চা মেয়েগুলো!' শুনে হঠাৎ আমার একটা ভাবান্তর ঘটল, ভারি লজ্জা

পেলাম, দুঃখ লাগল ওর জন্যে। আকর্ণ লাল হয়ে উঠে নিজেও প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে গিয়ে মিনতি করেছিলাম, যেন কিছু মনে না করেন, আমাদের নির্বোধ তামাসাগুলোর জন্যে যেন দোষ না ধরেন। ও কিন্তু বই বন্ধ করে, পড়া শেষ না করেই ঘর ছেড়ে চলে গেল। সারা দিন আমি অনুশোচনায় জ্বললাম। আমরা ছেলেমানুষেরাই যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে ওকে কাঁদিয়ে ছেড়েছি, ভাবতে অসহ্য লাগছিল। আমরা তো জানতামই ও কাঁদবে, আমরা তো চেয়েই ছিলাম ও কাঁদুক, ওর সহ্যের সীমা ভাঙুক! দুটি বাচ্চায় মিলে আমরা দুঃখী বেচারী লোকটিকে তার দুর্ভাগ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছি! সে রাতে আমি ঘুমতে পারিনি, নিজের ওপর এত রাগ হচ্ছিল, দুঃখ আর অনুশোচনায় এত জ্বলে যাচ্ছিলাম। লোকে বলে অনুশোচনায় নাকি মন হালকা হয়। একদম বাজে! তাছাড়া, আমার দুঃখের সঙ্গে কেমন একটু আহত অহমিকাও ছিল বুঝি। আমি চাইনি ও আমাকে বাচ্চা মেয়ে বলে গণ্য করবে। তখন আমার বয়স পনেরো।

সেদিন থেকে কি করে আমার সম্পর্কে পক্রোভ্স্কির ধারণা বদলানো যায়, তারই হাজার রকমের ফিকির

ভেবে ভেবে কল্পনা আমার মেতে উঠল। কিন্তু আমি ছিলাম লাজুক গোছের, ভারি ভীতু, স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুতেই মন বসাতে পারতাম না (আর সে কি সব স্বপ্ন!)। যেটুকু করা গেল সে শুধু এই যে সাশার সঙ্গে তামাসায় যোগ দেওয়া বন্ধ করলাম; ওতেই ওর রাগ পড়ে গেল। কিন্তু আমার অহমিকার কাছে এটুকু নিতান্তই কিছু নয়।

এবার আমার পরিচিতদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত, সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক এবং সবচেয়ে করুণ একটি মানুষ সম্পর্কে দুটো কথা বলি। এতক্ষণে তার কথা তুলছি কারণ এ পর্যন্ত তাকে আমি কোনো রকম লক্ষ্যেই আনিনি। লক্ষ্য করতে লাগলাম শুধু তখনই, যখন হঠাৎ পক্রোভ্স্কি সম্পর্কে সবকিছুই ভারি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল!

এ বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত একটি ছোটোখাটো বুড়ো মতো লোক—ময়লা পোষাক-আষাক, পাকাচুল, আড়ষ্ট ভাবভঙ্গি—মোটের ওপর ভারি অদ্ভুত। মনে হত লোকটা যেন সবসময়েই লজ্জা পেয়ে আছে, নিজেকে নিয়েই যেন তার লজ্জা। ফলে, লোকটা এমন সঙ্কুচিত, অস্বচ্ছন্দ হয়ে থাকত, এমন ছটফট করত যে সন্দেহ

হত লোকটার মাথা ঠিক আছে কিনা। বাড়িতে এসে ঢোকার সাহস হত না ওর, দাঁড়িয়ে থাকত কাচের দরজার বাইরে। ও পথ দিয়ে যদি কেউ যেত, আমি অথবা সাশা অথবা ভালোমানুষ গোছের কোন চাকর-বাকর, তাহলে ও নানা রকম হাতছানি দিয়ে ডাকত আমাদের। হাত ইশারায় জবাব দিয়ে ওকে যখন বোঝানো হত যে বাড়িতে অপরিচিত কেউ নেই, অনায়াসে সে আসতে পারে, তখন সে দরজাটি খুলত সন্তর্পণে, আনন্দে হাসত, হাতে হাত ঘষত খুশিতে, এবং পা টিপে টিপে চলে যেত পক্রোভ্স্কির ঘরে। লোকটা হল পক্রোভ্স্কির বাবা।

ওর খুঁটিনাটি পুরো কাহিনী আমি পরে শুনেছি। কোথায় যেন কেরানির কাজ করত ও। তাতে কোনো দক্ষতা দেখাতে পারেনি, পদটা ছিল নেহাৎ তুচ্ছ। প্রথম বৌ, পক্রোভ্স্কির মা, মারা যাবার পর ও ফের বিয়ে করে। নতুন বৌকে নিয়ে সবকিছুই গণ্ডগোল বেধে গেল। মেয়েটি কাকেও শান্তি দিত না, সবাইকে রাখত হাতের মুঠোয়। পক্রোভ্স্কি তখন দশ বছরের ছেলে। সৎ মা তাকে দু’চোখে দেখতে পারত না, কিন্তু কপাল ভালো ছিল ওর। পক্রোভ্স্কির বাপের সঙ্গে জানা ছিল এবং তার উপকার করেছিলেন এমন একজন জমিদার—

নাম তাঁর বীকভ, তিনি ছেলেটির সাহায্যের জন্যেও এগিয়ে এলেন এবং পক্রোভ্স্কিকে স্কুলে পাঠালেন। ছেলেটি সম্পর্কে তাঁর দরদের কারণ, ছেলের বিগতা মাকে তিনি জানতেন, তরুণী মহিলাটির হিতৈষিণী হিসেবে হাজির হয়েছিলেন আন্না ফিওদরভ্না, এবং তিনিই পক্রোভ্স্কির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেন। আন্না ফিওদরভ্নার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বীকভ। দয়াপরবশ হয়ে তিনি বিয়েতে যৌতুক হিসেবে পাঁচ হাজার রুবল দান করেছিলেন। সে টাকাটার কি হল তা জানা যায়নি। আন্না ফিওদরভ্নার কাছ থেকে আমি এইটুকুনই শুনেছিলাম। তরুণ পক্রোভ্স্কি তার পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে কথা কইতে পছন্দ করত না। শুনেছিলাম, পক্রোভ্স্কির মা নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু অমন শোচনীয় একটা বিয়ে তিনি কেন করেছিলেন, ভেবে অবাক লাগে। অল্প বয়সেই মারা যান উনি, বিয়ের চার বছর পরেই।

ইস্কুলের পড়া শেষ করে পক্রোভ্স্কি উচ্চ শিক্ষায়তনে এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। বীকভ প্রায়ই পিটার্সবুর্গে আসতেন—ছেলেটির অভিভাবকতা তিনি পরিহার করেননি। অস্বাস্থ্যের কারণে যখন ছেলেটি

পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, তখন বীকভ তাকে আন্না ফিওদরভ্‌নার কাছে সুপারিশ করে পাঠান। সাশাকে পড়ানোর বদলে আন্না ফিওদরভ্‌না তাকে থাকতে খেতে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পক্ষের বৌকে নিয়ে বুড়ো পক্রোভ্‌স্কি এমন জ্বালাতনে পড়ে, যে শেষ পর্যন্ত জঘন্যতম বদভ্যাস শুরু হয় তার। সবসময়েই মদ খেয়ে থাকতে শুরু করল সে। বৌ ওকে ধরে পিটত, রান্নাঘরে বন্ধ করে রাখত। অবশেষে এমন এক অবস্থায় ওকে এনে ফেলল, যে কিলঘুষি আর নির্যাতনের কোনো বোধই আর তার রইল না, নালিশ করা পর্যন্ত সে ছেড়ে দিলে। আসলে বয়স খুব একটা বেশি না হলেও, নেশায় তার বুদ্ধিভ্রংশের উপক্রম হয়েছিল। ওর মধ্যে মানবিক গুণ বলতে একমাত্র যেটুকু বাকি ছিল, তা শুধু পুত্র পক্রোভ্‌স্কির প্রতি স্নেহ—ছেলেটা তার মায়ের চেহারা পেয়েছিল। হয়ত সেই মমতাময়ী প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতির জন্যেই এই ভেঙে-পড়া বুড়ো মানুষটার পুত্রস্নেহের এমন প্রাবল্য। ছেলের কথা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারত না, বলতে পারত না। সপ্তাহে দেখতে আসত মাত্র দুবার

করে কারণ বেশি আসার সাহস পেত না ও, পুত্র পক্রোভ্স্কি সেটুকুও সইতে পারত না। ছেলের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি ছিল বাপের প্রতি অশ্রদ্ধা। কিন্তু এ কথাও মানতে হবে যে মাঝে মাঝে দুনিয়ার সবচেয়ে অপ্রীতিকর জীব বলে মনে হত বুড়োটাকে। প্রথমত, লোকটা ছিল ভারি কৌতূহলপরায়ণ। দ্বিতীয়ত, নিতান্ত তুচ্ছ ও অর্থহীন আলাপ ও জিজ্ঞাসাবাদ করে পক্রোভ্স্কির পড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করত এবং শেষ কথা, লোকটা সবসময় প্রকৃতিস্থ থাকত না। বাপের বদভ্যাস, তার অযথা কৌতূহল ও বকবকানি থামাবার জন্যে ছেলে চেষ্টা করত। তাতে ফল হল এই যে বাপ ছেলেকে প্রায় দেবতার মতো মান্য করতে শুরু করলে, এবং বিশেষ অনুমতি না নিয়ে মুখ খুলতে পর্যন্ত সাহস পেত না।

পেতেঙ্কার (ছেলেকে এই নামেই বুড়ো ডাকত) প্রশংসা করে বুড়োর ক্লান্তি ছিল না। যখনই ছেলেকে দেখতে আসত, তখনই দেখা যেত বুড়োর মুখচোখে একটা ভীরু ভীরু হতাশার ভাব — কেন না কি রকম অভ্যর্থনা জুটবে, তা জানা নেই। ইতস্তত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকত বুড়ো, আর দৈবাৎ যদি আমার দেখা পেত, তাহলে ঝাড়া বিশ মিনিট ধরে সে আমাকে তার পেতেঙ্কা

সম্পর্কে প্রশ্ন করে চলত: শরীর কেমন আছে তার? মেজাজ কেমন আছে? জরুরী কোনো কাজে ব্যস্ত আছে কি? ব্যস্ত থাকলে, সে জরুরী কাজটা কি? লিখছে, পড়ছে, না কি শুধু ভাবছে? যথেষ্ট পরিমাণে বুড়োকে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করলে তবে সে মন ঠিক করে দরজা খুলত—কিন্তু খুলত কি সন্তর্পণে! তারপর মুখটি বাড়িয়ে দিত দরজার ফাঁক দিয়ে। যখন বোঝা যেত যে ছেলে রাগ করে নেই, এমন কি মাথা নেড়ে অভিবাদন পর্যন্ত করেছে, তখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে কোট টুপি খুলত—টুপিটা তার সর্বদাই থাকত দলামোচড়া, ফুটো-ফুটো, এবং কানাভাঙা। কোট টুপি ঝুলিয়ে রেখে একই রকম সাবধানে বসত চেয়ারে, এবং সারাক্ষণ পেতেঙ্কার দিকে চেয়ে থেকে বুঝি তার মেজাজ কি রকম আন্দাজ করার চেষ্টা করত। পেতেঙ্কার মেজাজ খারাপ থাকলে ও তক্ষুণি টের পেয়ে উঠে দাঁড়াত, বিড়বিড় করে বোঝাবার চেষ্টা করত যে সে এই পথ দিয়েই যাচ্ছিল, একটু বসে গেল আর কি। তারপর বিনীতের মতো কোট আর সেই ন্যাতার মতো টুপিটা নিয়ে ফের সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে যেত পা টিপে টিপে—দুঃখের ভার চাপা দেবার জন্যে মুখটা থাকত একটু হাসিহাসি।

আবার যদি ভালো অভ্যর্থনা জুটত, তাহলে বুড়োর আনন্দ আর ধরত না। মুখের প্রতিটি রেখায়, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে বেরুত তৃপ্তি। পেতেঙ্কা যদি ওর সঙ্গে বাক্যালাপে রাজী হত, তাহলে চেয়ার ছেড়ে একটু উঠে দাঁড়াত সে, উত্তর দিত বাধ্য বিনীত একটা ভঙ্গিতে, প্রায় রুদ্ধশ্বাস সসম্ভ্রমে, এবং অতিশয় শালীন অর্থাৎ প্রায় হাস্যকর একটা ভাষায়। কথা বলায় বেচারার দক্ষতা ছিল না, গুলিয়ে ফেলত, লাল হয়ে উঠত মুখ, হাত দুটো নিয়ে, নিজেকে নিয়ে কি করবে যেন ভেবে পেত না, এবং অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে বিড়বিড় করে জবাবটাকে ঠিক করে নিতে চাইত। যদি দৈবাৎ সঠিক জবাব বেরুত ওর মুখ দিয়ে, তাহলে একেবারে বুক টান করে, ওয়েস্ট কোট, টাই আর ফ্রক-কোট ঠিক করে নিয়ে জ্বলজ্বল করে উঠত ও ভারিক্কি চালে। মাঝে মাঝে সাহস করে আস্তে উঠে পায়চারি করে যেত বইয়ের আলমারির কাছ পর্যন্ত, যে কোনো একটা বই টেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ কিছু না কিছু পড়তে শুরু করে দিত। বিরল এই সব মুহূর্তে তাকে দেখাত যেন এক মার্জিত রুচি ভদ্রলোক, কোনো রকম কিছু অস্বস্তি নেই, যেন পেতেঙ্কার কাছ থেকে এমনি সদয় ব্যবহারে

সে অভ্যস্ত। কিন্তু একবার, আমি তখন সেখানে ছিলাম, দেখেছি বইগুলো নাড়াচাড়া না করবার জন্যে ছেলে হুকুম দেওয়া মাত্রই কি রকম ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। বিব্রত ও হতভম্ব হয়ে সে বইটা উল্টো করে গুঁজে রাখল তারপর ভুল সংশোধন করতে গিয়ে ফের ঢুকিয়ে রাখল পিঠের দিকটা আগে করে। আর সারাটা ক্ষণ লাল হয়ে হাসল কিন্তু কি করতে হবে বুঝে উঠতে পারল না। বাপের অভ্যেস বদলাবার জন্যে পত্রোভ্স্কি ঠিক করেছিল, ও যদি পর পর তিনবার প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আসতে পারে তাহলে পঁচিশ কি পঞ্চাশ কি আরো বেশি কোপেক ওকে দেওয়া হবে। নয়ত উপহার পাবে নতুন এক জোড়া বুট, কি টাই কি ওয়েস্ট কোট। তা পেয়ে বুড়ো মানুষটা একেবারে ময়ূরের মতো গর্বে ফুলে উঠত। মাঝে মাঝে ও আসত আমাদের কাছে, সাশা আর আমার জন্যে মশলাদার রুটি আর আপেল নিয়ে এসে আলাপ করত পেতেঙ্কার সম্পর্কে। আমাদের উপদেশ দিত মন দিয়ে পড়াশুনা করতে, এবং বারংবার বোঝাত যে পেতেঙ্কা হল একটি সুপুত্র, ছেলের মতো ছেলে, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, একটি বিদ্বান পুত্র। এই কথা বলে সে এমন হাস্যকরভাবে আমাদের দিকে চেয়ে

চোখ মটকাত নয়ত এমন মুখের ভাব করত যে হেসে ফেটে পড়তাম আমরা। মাও লোকটাকে পছন্দ করত, কিন্তু আন্না ফিওদরভ্‌নাকে বুড়োটা দেখতে পারত না, অথচ উনি সামনে থাকলে, ও হয়ে উঠত একেবারে ইঁদুরের চেয়েও শান্ত আর পদধূলির চেয়েও বিনীত।

পক্রোভ্‌স্কির কাছে আমার পড়াশুনার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছিল। আমাকে সে তখনো ভাবত ছেলেমানুষ—সাশার মতোই একটি দামাল স্কুলের মেয়ে। এতে মনে ঘা লাগত আমার, কেন না আমার পূর্বতন বিচ্যুতি আমি সংশোধন করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সে বিষয়ে ও কোনো নজরই দিত না, তাতে আরো বেশি রাগ হত আমার। পড়া ছাড়া ওর সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় বলতামই না—সুযোগ পেলেও বলা সম্ভব হত না। কেমন লাল হয়ে উঠে গলায় কথা আটকে যেত—তারপর কোণে গিয়ে কাঁদতাম রাগে।

এর পরিণতি কি হত কে জানে, কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একদিন সন্ধ্যেয় মা যখন আন্না ফিওদরভ্‌নার ঘরে, তখন আমি চুপি চুপি ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। জানতাম ও বেরিয়ে গেছে। কেন যে ও কাজ করলাম বলতে পারি না। এক বছরেরও

বেশি পাশাপাশি থাকলেও এর আগে কখনো ওর ঘরে আমি ঢুকিনি। বুক টিপ টিপ করছিল প্রচণ্ড। সভয় কৌতূহলে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম চারিদিকে। ঘরে আসবাবপত্র সামান্য, রেখেছেও অগোছালো করে। দেয়াল বরাবর পাঁচ থাক বই। চেয়ার টেবিলগুলো কাগজে ভর্তি। সর্বত্র শুধু বই আর কাগজ! হঠাৎ একটা বিদঘুটে চিন্তা ঢুকল মাথায় — অস্বস্তিকর আর বিরক্তকর একটা চিন্তা — আমার বন্ধুত্ব আর ভালোবাসায় ওর কি এসে যায়? ও হল বিদ্বান লোক — আর আমি একেবারে মুখ্যু, কিছুই জানি না আমি, কিছুই পড়িনি, একটি বইও নয়... বই-ভরা থাকগুলোর দিকে আমি চেয়ে রইলাম ঈর্ষা নিয়ে। আহত, বিরক্ত এবং প্রায় রাগত ভাবে স্থির করে বসলাম, অবিলম্বে ওই বইগুলোর সমস্ত পড়ে ফেলতে হবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকটি, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। হয়ত আমার ধারণা হয়েছিল, ও যা জানে, তা জানার পর নিশ্চয় আমি ওর বন্ধুত্বের যোগ্য হতে পারব। তাড়াহুড়ো করে আমি হাতের কাছে যা পেলাম তাই, পুরনো ধুলো-মাখা একটা বই টেনে নিয়ে, কখনো লজ্জায় রাঙা হয়ে কখনো ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে ভয়ে আর

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে এলাম। ঠিক করেছিলাম, মা ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রে মোমবাতির আলোয় পড়ে শেষ করব।

কিন্তু ঘরে গিয়ে বইটা খুলে কি হতাশই না হলাম। দেখা গেল জিনিসটা ল্যাটিনে লেখা, পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া পোকায় কাটা একটি বই। তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে বইটা শেল্‌ফে তুলে রাখতে গেছি, এমন সময় বারান্দায় গোলমাল আর পায়ের শব্দ শোনা গেল। জিনিসটা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে পড়লাম আমি—এমন ঠেসে রাখা ছিল বইটা, যে সরাবার মাত্রই আশেপাশের বইগুলো সরে এসে ওর জায়গাটা ভরে দিয়েছে। কিছুতেই ফের ওটাকে ঠেসেঠুসে ভরতে পারছিলাম না। যথাশক্তি জোর দিয়ে ঠেলতে শুরু করলাম। মরচে-ধরা যে পেরেকগুলোর ওপর শেল্‌ফ্‌টা টাঙানো ছিল, তারা বোধ হয় এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, বইপত্তর সমেত হুড়মুড় করে নেমে এল শেল্‌ফ্‌টা। সেই সময় দরজা খুলে পক্রোভ্‌স্কি ঢুকল ঘরে।

এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে বই নিয়ে কেউ কিছু করলে পক্রোভ্‌স্কি সইতে পারত না। বইগুলো কেউ যদি ছুঁয়ে দেখতে চাইত, তাহলেই হত আর কি!

তাই সরু মোটা নানা চেহারা এবং নানা আকৃতির বইগুলো যখন দুমদাম করে মেঝেয় পড়ে টেবিল চেয়ারের তলা থেকে শুরু করে ঘরের সবখানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে যেতে লাগল তখন আমার যে কি আতঙ্ক তা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। ইচ্ছে হয়েছিল পালাই, কিন্তু তখন বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলাম, এই শেষ, একেবারে শেষ! হা, হতোস্মি! দফারফা একেবারে! দশ বছরের মেয়ের মতো দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়েছি! নেহাৎ একটা উজবুকের মতো! বেদম বোকা একটা মেয়ে!! পক্রোভ্স্কি একেবারে রেগে আগুন। চেঁচিয়ে উঠল, 'বা বেশ, আরো বাকি আছে কিছু? এ রকম দুষ্টুমি করতে লজ্জা করে না তোমার? বয়স হবে না কখনো?' বইগুলো কুড়োবার জন্যে সে হাঁটু গেড়ে বসল। সাহায্য করার জন্যে আমিও নিচু হতেই সে ধমকে উঠল, 'থাক থাক হয়েছে! এবার থেকে বিনা নিমন্ত্রণে ঘরে না ঢুকলেই বরং ভালো হয়।' কিন্তু আমার বিনীত মুখভাব বোধ হয় ওর নজরে পড়েছিল। গলার স্বর সে শিক্ষকের তিরস্কারের মতো একটু নরম করে আনলে, আমাদের সাম্প্রতিক পাঠাভ্যাসের মতো নরম। 'কবে তোমার চৈতন্য হবে? দয়া করে একটু ভেবে

দেখো: তুমি তো ছেলেমানুষ নও, কচি খুকিটি নও। পনেরো বছর বয়স।' এবং যেন এই সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যেই ও আমার দিকে তাকাল এবং তাকিয়েই হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। কিছু না বুঝে আমি তাকিয়েই ছিলাম। ও উঠে দাঁড়িয়ে বিব্রতের মতো এগিয়ে এসে কি জন্যে যেন মাফ চাইলে, হয়ত এই জন্যে যে ওর নজরে পড়েছে আমি বড়ো হয়ে উঠেছি। অবশেষে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল আমার। ঠিক কি যে করেছিলাম তখন জানি না। এইটুকু জানি যে ওর চেয়েও বেশি লাল হয়ে উঠেছিলাম আমি। এবং ত্রস্তে মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম ঘর থেকে।

লজ্জা রাখার ঠাঁই ছিল না আমার। ওর ঘরে গেছি, তা দেখে ফেলেছে ও! তিন দিন ধরে ওর দিকে চাইতে পারিনি আমি, লজ্জায় এত লাল হয়েছি যে চোখে জল এসে গেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব এলোমেলো চিন্তা এসে ভিড় করেছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ভাবনাটা হল এই, যাই ওর কাছে সব খুলে বলি—সবটা জানিয়ে ওকে বোঝাই যে আমি নিতান্ত একটি বোকা মেয়ে নই, সৎ উদ্দেশ্য ছিল আমার। মন প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলাম কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সাহসে কুলোল না! বেশ বুঝি,

তাতে আরো কি বোকাই না লাগত আমাকে। এখনো ভাবতে লজ্জা করে।

দিন কয়েক পরে মা খুব কঠিন অসুখে পড়লেন। শয্যা নিলেন তিনি। তৃতীয় দিন রাত থেকে জ্বর খুব বেড়ে গেল, ভুল বকতে লাগলেন। ওষুধপত্র আর জল খাওয়াতাম আমি—এক মিনিটের জন্যেও ছেড়ে যেতাম না। প্রথম রাত মোটেই ঘুমোতে পারিনি, দ্বিতীয় রাতে আমি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, জেগে থাকতেই পারছিলাম না। অনবরত চোখের সামনে যেন সবুজ সবুজ বিন্দু জেগে উঠছে, আর সবকিছুই ভেসে চলেছে। মা'র কাহিল কাতরানির শব্দ না থাকলে যে কোনো মুহূর্তেই আমি ঘুমে ঢলে পড়তে পারতাম। থেকে থেকেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠছিলাম, কিন্তু ঠিক আগের মতোই ফের চুপিসাড়ে এসে হাজির হচ্ছিল ঘুম। সে এক ভারি যন্ত্রণা! আমি বলতে পারব না, ঠিক মনে নেই আমার, কিন্তু ঘুম আর জাগায় যখন এমনি ভারি লড়াই চলছে তখন হঠাৎ একটা অদ্ভুত স্বপ্ন একটা বিভীষিকা আমার অতিক্লান্ত মনের ওপর কেমন ভেসে উঠল। চমকে জেগে উঠলাম আমি... ঘরটা অন্ধকার, রাতের মোমবাতিগুলো শুধু কাঁপছে, সারা ঘরে তাদের আলো কখনো দপদপ

করছে, কখনো দেয়ালের ওপর সরে আসছে, কখনো বা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভয়—অদ্ভুত একটা আতঙ্ক ঘিরে ধরল আমাকে, একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমার কল্পনা জড়িয়ে গিয়ে বুক হিম হয়ে এল আমার... কষ্টের, অসহ্য যন্ত্রণার একটা চিৎকার করে আমি লাফিয়ে উঠলাম চেয়ার থেকে। ঠিক সেই সময় দরজা খুলে পক্রোভ্স্কি ঘরে ঢুকল।

মনে আছে, চৈতন্য ফিরে আসতে দেখি আমি পক্রোভ্স্কির আলিঙ্গনে ধরা। আস্তে করে সে আমায় একটা চেয়ারে বসিয়ে এক গেলাস জল খেতে দিলে, তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিগ্যেস করে গেল। কি যেন বলেছিলাম আমি—কি বলেছিলাম মনে নেই।

আমার হাতটা টেনে নিয়ে ও বললে, 'তোমার অসুখ করেছে, বেশ অসুখ। জ্বরজ্বর লাগছে, এমন করলে তো স্বাস্থ্য টিকবে না। একটু বিশ্রাম দরকার। যাও শুয়ে ঘুমিয়ে নাও দেখি। দু'ঘণ্টা পরে ডেকে দেব। যাও শুয়ে পড়ো তো, লক্ষ্মীটি।' প্রতিবাদের কোনো সময় না দিয়েই ও জিদ করতে লাগল। ক্লান্তিতে আমি তখনই ঢলে পড়ার মুখে, চোখের পাতা তুলতে পারছি না। আধ ঘণ্টা খানেক জিরিয়ে নেব এই ভেবে আমি

চেয়ারের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসলাম। কিন্তু ঘুমোলাম সকাল পর্যন্ত, পক্রোভ্স্কি তখন আমাকে ডেকে দিয়েছিল, কেন না তখন মা'র ওষুধ খাওয়াবার সময়।

পরের রাত্রে বিছানার পাশে বসে আছি, স্থির সঙ্কল্প করেছি ঘুমিয়ে পড়া চলবে না, এমন সময় ঠিক এগারোটায় পক্রোভ্স্কি এসে দরজায় কড়া নাড়লে। দরজা খুলে দিতেই জিগ্যেস করলে, 'একা একা বসে থাকতে খুব নিঃসঙ্গ লাগবে না? এই বইটা নাও, সময় কাটাতে পারবে।' কৃতজ্ঞচিত্তে বইটি নিলাম। মনে নেই, বইটার নাম কি অথবা আদৌ তার কোনো পাতা উল্টিয়েছিলাম কিনা, কিন্তু সে রাতে এক মুহূর্তও ঘুম আসেনি। অদ্ভুত এক আনন্দ আমায় জাগিয়ে রেখেছিল। অস্থির লাগছিল আমার, চুপ করে বসে থাকতে পারছিলাম না, বারবার উঠে পায়চারি করছিলাম ঘরময়। ভেতরে ভেতরে একটা আনন্দের উত্তাপে জ্বলজ্বল করছিলাম আমি, তৃপ্তি পেয়েছি আমি! ও যে আমার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, আমার কথা ভেবে যে ওর ভাবনা হয়েছে, তাতে খুশি লাগছিল আমার। সারা রাত আমি বসে বসে ভাবলাম আর স্বপ্ন দেখলাম। সে রাতে ও আর আসেনি, জানতাম আসবে না। ভাবতে লাগলাম, পরের রাতেও সে কি আসবে না?

পরদিন সন্ধ্যেয় সকলে শুতে গেলে, পক্রোভ্স্কি তার ঘরের দরজা খুলে চৌকাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা কইলে। কি কথা আমরা বলাবলি করেছিলাম, তার একটুও মনে নেই, শুধু মনে আছে, লাল হয়ে উঠছিলাম আমি, অথচ এই সাক্ষাৎকারেরই তো আকাংক্ষা আমি করে এসেছি, সারা দিন ধরে তার স্বপ্ন দেখেছি, মনে মনে আমার প্রশ্ন আর জবাব আউড়ে নিয়েছি বারবার, তবু চাইছিলাম কথা শেষ হয়ে যাক, আর তাতে আরো গোলমাল আর বিরক্ত ধরে যাচ্ছিল নিজের ওপর… সেই সন্ধ্যে থেকে শুরু হল আমাদের বন্ধুত্ব। মায়ের সারাটা অসুখ আমরা প্রত্যেক দিন রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা করে একত্রে কাটাতাম। ক্রমে ক্রমে আমার লজ্জা কেটে যেতে লাগল, যদিও তখনো প্রত্যেকবার আলাপের পরই রাগ হত নিজের ওপর। আর গোপনে গোপনে এই দেখে আমার আনন্দ হত যে ও তার সেই বিছছিরি বইগুলোকে ভুলতে শুরু করেছে। একদিন সেই বইয়ের শেল্ফ্ উল্টে ফেলা নিয়ে রহস্য করে কথা হচ্ছিল। কেমন একটা অদ্ভুত মেজাজ এসেছিল আমার, সেই মুহূর্তে মন খুলে একেবারে অকপট হবার একটা ঝোঁক পেয়ে বসেছিল আমাকে… বিচিত্র এক উন্মাদনার

আবেগে ওকে খুলে বললাম যে আমি চেয়েছিলাম শিখতে, আরো বেশি জানতে, ছেলেমানুষ বলে আমাকে মনে করবে তা সহ্য হচ্ছিল না... সত্যিই বোধ হয় এক অদ্ভুত মেজাজে পেয়েছিল আমাকে—ভেতরটা দরদে ভরপুর হয়ে উঠেছিল, চোখে এসে পড়েছিল জল। সবকিছুই ওকে বললাম আমি। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই, ওকে যত্ন করতে চাই, এক হয়ে যেতে চাই ওর সঙ্গে, ওকে চাই সান্ত্বনা দিতে। অদ্ভুতভাবে ও তাকাল আমার দিকে, কেমন অবাক আর বিব্রতভাবে, কিছু বললে না। হঠাৎ কেমন আহত আর হতাশ লাগল আমার। ও হয়ত বোঝেনি, হয়ত হাসবে মনে মনে। ফোঁপানির একটা দমক কিছুতেই চেপে রাখতে না পেরে আমি ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললাম। ও আমার হাত দুটি নিয়ে চুমু খেয়ে বুকে চেপে ধরলে, সান্ত্বনা দিলে অস্ফুট স্বরে। ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল। কি ও বলেছিল আমার মনে নেই—শুধু মনে আছে আমি একবার কাঁদি একবার হাসি, ফের কাঁদি—গাল দুটো যেন আমার পুড়ে যাচ্ছিল, একটি কথাও আমি বলতে পারিনি আনন্দে। উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় থাকলেও লক্ষ্য করলাম, ও কেমন আড়ষ্ট আর অস্বস্তি বোধ করছে।

হয়ত আমার উচ্ছ্বাস, আমার আকস্মিক ভাবাবেগ দেখে বিস্ময়ের ঘোর তার তখনো কাটেনি। হয়ত প্রথমটায় শুধু ওর কৌতূহলই জেগেছিল, কিন্তু পরে আমার প্রীতি, আমার আকুল কথাবার্তা আর দরদ ও গ্রহণ করেছিল আর তাতে সাড়া দিয়েছিল আমারই মতো অকপটে, বন্ধুর মতো, প্রায় ভাইয়ের মতো মনোযোগ আর স্নেহ নিয়ে। এত ভালো লেগেছিল আমার, এতো শান্তি পেয়েছিলাম।... পরস্পরের কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন রইল না আর। এটা সে বেশ অনুভব করেছিল, দিনের পর দিন ও আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল আমার কাছে।

মায়ের বিছানার পাশে বাতির দপদপে আলোয় সেই ব্যাকুল-মধুর রাতের মুহূর্তগুলোয় আমরা কি না বলাবলি করেছি। মনে যা আসত, যা কিছু ছাড়া পেত বুকের মধ্যে থেকে, সবই বলতাম আমরা, আর যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলাম সুখে... ভারি আনন্দের দিন ছিল সেগুলি, যদিও ভারি করুণ —মনে করতে গেলে যেমন আনন্দ তেমনি কষ্ট লাগে। সুখেরই হোক কি দুঃখেরই হোক, স্মৃতি মাত্রেই বুঝি কষ্টের, অন্তত আমার কাছে। কিন্তু সে কষ্টটাও কেমন আনন্দের মতো।

বুক যখন ভার হয়ে থাকে, তখন দুপুরের গরমে পোড়া ক্লান্ত ফুলের ওপর সিক্ত সান্ধ্য-শিশিরের মতো স্মৃতি আমাদের প্রাণ তাজা করে তোলে।

মা ভালো হয়ে উঠছিলেন। রোগশয্যার পাশে আমি তখনো বসে থাকতাম। মাঝে মাঝে পত্রোভূস্কি আমায় বই দিয়ে যেত। প্রথমে সেগুলো পড়তাম নেহাৎ জেগে থাকার জন্যে, পরে পড়তে শুরু করলাম আরো একটু মন দিয়ে এবং পরিশেষে উদ্‌গ্রীব হয়ে। নতুন নতুন অপ্রত্যাশিত অনেক কিছু পেতে লাগলাম বইয়ের মধ্যে, তাজা তাজা নানা ভাবে মন ভরে উঠতে লাগল। যে বিষয়বস্তু বুঝতে যত উত্তেজনা লাগত, ততই সেটা প্রিয় হয়ে উঠত আমার কাছে, ততই মধুর লাগত মনে মনে। বুকের মধ্যে ভিড় করে এসে এগুলি আমাকে নিয়ে যেত এক বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যে। সৌভাগ্যবশত এই আত্মিক অভিযান সত্ত্বেও আমি একেবারে বেসামাল হয়ে যাইনি। স্বপ্নাতুর ছিলাম তাই আমার বাঁচোয়া।

মা ভালো হয়ে যেতে আমাদের সান্ধ্য সাক্ষাতের পালা শেষ হল, দীর্ঘ আলাপ বন্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে দু একটুকরো আলাপ হত আমাদের কদাচিৎ—সে সব কথা এমনিতে তুচ্ছ কিন্তু আমাদের কাছে তা ভরে

উঠত বিচিত্র কত গোপন ব্যঞ্জনায়। তখন আমি সুখী, শান্ত, একেবারে সুখী। কয়েক সপ্তাহ কাটল এমনি করে...

বুড়ো পক্রোভ্স্কি একদিন আমাদের দেখতে এল। চিরকালই সে বকবক করত বেশি, সেদিন আবার ছিল একটু অস্বাভাবিক ভালো মেজাজে, খুশি আর কথা যেন তার ধরে না। হাসল, রহস্য করল এবং পরিশেষে তার আহ্লাদের কারণ জানিয়ে আমাদের বলল যে আর এক সপ্তাহ পরে পক্রোভ্স্কির জন্মদিন, সেদিন সে তার ছেলেকে দেখতে আসছে তার নতুন ওয়েস্ট কোট আর বুট পরে, বৌ তা কিনে দেবে বলে কথা দিয়েছে। মোটের ওপর বুড়ো বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল এবং বকবক করে চলল অনবরত।

ওর জন্মদিন। দিনরাত আমি শুধু সেই কথাই ভাবতে লাগলাম। আমিও ওকে একটা কিছু জন্মদিনের উপহার দেব আমাদের বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, কিছু বই দেওয়া যাক। জানতাম সাম্প্রতিক সংস্করণের পুশ্‌কিন পেলে ও খুশি হবে। অতএব পুশ্‌কিনই দেব ওকে। সেলাই করে করে আমি প্রায় তিরিশ রুবলের মতো জমিয়েছিলাম—ঠিক ছিল তাতে আমার একটা

ফ্রক কেনা হবে। রান্নাঘরের ঝি মাত্রিওনাকে পাঠালাম পুরো সেটের দাম জেনে আসতে। কিন্তু হায়রে কপাল! মলাট সমেত এগারোটি বইয়ের দাম কমপক্ষে ষাট রুবল। কোথায় পাব এত টাকা? ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না। মা'র কাছে চাইতে পারছিলাম না। তিনি অবিশ্যি আমাকে দিতেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে বাড়ির সকলেই ব্যাপারটা জেনে ফেলত এবং ধরে নেওয়া হত, পক্রোভ্স্কি পড়িয়েছে বলে উপহারটা তারই কৃতজ্ঞতা মাত্র। আমি চাইছিলাম উপহারটা হবে একান্তই আমার, সবার অলক্ষ্যে। আমার জন্যে সে যে মেহনত করেছে, তার জন্যে নয়, সে আমার চিরকালের ঋণ, শোধ দেব শুধু আমার বন্ধুত্ব দিয়ে। অবশেষে একটা পথ পাওয়া গেল।

জানতাম, গস্তিনি দ্ভোর-এ মাঝে মাঝে প্রায় নতুনের মতো দেখতে পুরনো বই বিক্রি হয়, দর কষাকষি করতে পারলে অর্ধেক দামে তা পাওয়া সম্ভব। ঠিক করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গস্তিনি দ্ভোরে যাব। পরদিনই সুযোগ মিলে গেল: পরের দিন আমাদের কিছু কেনা কাটার দরকার ছিল এবং যেহেতু মায়ের শরীর খারাপ আর সৌভাগ্যবশত আন্না ফিওদরভ্নারও

আলসেমি লাগছিল, তাই কাজটা পড়ল আমার ওপরে। মাত্রিওনার সঙ্গে বেরুলাম।

অবিলম্বে সুন্দর করে বাঁধানো এক সেট পুশ্‌কিনও পাওয়া গেল। দরাদরি করতে শুরু করলাম। দোকানদার প্রথমে বাজারের চেয়েও বেশি দাম হাঁকল। কিন্তু পরে নানা ঝামেলা এবং বার কয়েক ফিরে চলে যাবার ভান করায় দোকানী নেমে এল রৌপ্য মুদ্রায় দশ রুবলে। কি মজা এই দরাদরির ব্যাপারটা!... বেচারি মাত্রিওনা বুঝে পাচ্ছিল না, অত উত্তেজনা আমার কি কারণে, অতগুলো বই-ই বা আমার কিসের দরকার। কিন্তু মুশকিল হল এই যে আমার কাছে তিরিশ রুবল ছিল ব্যাঙ্ক নোটে, এবং দোকানী যা বলেছে তার এক পয়সা কমে সেট ছাড়তে সে রাজী নয়। কিন্তু আমি ঝকাঝকি করতে লাগলাম এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর ও একটু ছাড়লে এবং আরো আড়াই রুবল দর নামালে। ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে বললে, এটা সে কমালে শুধু এই জন্যে যে আমি ভারি সুন্দর এক তরুণী, দুনিয়ায় আর কারো জন্যে সে এতটা কমাত না। তবু আড়াই রুবল এখনো বাকি। হতাশ হয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলতাম, এমন সময় একটা আকস্মিক ঘটনায় আমার সমস্যা মিটল।

অদূরে, অন্য একটা বইয়ের টেবিলে দেখলাম বুড়ো পক্রোভ্স্কিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে চার পাঁচটি বইয়ের দোকানী, ওরা ওকে প্রায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বইটির গুণগানে মুখর। রাশি রাশি বই দেখাচ্ছে ওকে। যা দেখছে, তাতেই ওর ঔৎসুক্য। কোনটা নিতে হবে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না বুড়ো। আমি গিয়ে যখন জিগ্যেস করলাম, কি করছে সে, বুড়ো একেবারে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। ভারি ভালোবাসত বুড়ো আমাকে, হয়ত তার পেতেঙ্কার চেয়ে কম নয়। 'বই কিনছি, ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না, পেতেঙ্কার জন্যে কিছু বই। ওর জন্মদিন আসছে, বই ও ভালোবাসে কিনা, তাই বই কিনছি।' বুড়োটার কথা বলার ধরণ এমনিতেই হাস্যকর, তদুপরি তখন সে বিব্রত এবং বিমূঢ়। যে বই-ই তার পছন্দ হয়, দাম তার এক কি দুই কি তিন চাঁদি রুবল মাত্র। বড়ো বড়ো বইগুলোর দাম অবশ্য সে জিগ্যেস করছিল না, সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে দেখে পাতা নাড়াচাড়া করে সযত্নে রেখে দিচ্ছিল। বিড়বিড় করে বলছিল, 'না, না, ওটা বড়ো দামী। বরং ঐগুলো দেখি তো?' এই বলে ফের সে সস্তা দামের মাসিক পত্র, গানের বই আর

সঙ্কলনগুলোর পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম, 'এ সব কিনে কি হবে, বাজে বই যত সব।' ও বললে, 'আরে না, না। ভালো ভালো বই আছে এখানে, চমৎকার চমৎকার বই।' শেষের কথাগুলো ও এমন টেনে টেনে উচ্চারণ করলে, যে মনে হল বুঝি ও কেঁদে ফেলবে এই জন্যে যে ভালো বইগুলোর দাম বড়ো বেশি। কল্পনায় বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম, কি করে একটা চোখের জলের ফোঁটা গাল থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসবে ওর লাল নাকের ওপর। জিগ্যেস করলাম, কত টাকা ওর আছে। 'ও, তা,' বলে বিড়বিড় করে বুড়ো এক টুকরো খবরের কাগজে মোড়া তার গোটা তহবিলটা বার করে দেখালে। 'একটা আধ রুবল, একটা কুড়ি কোপেকি সিক্কা, আর তামার পয়সায় আরো কুড়ি কোপেক।' ওকে টেনে নিয়ে এলাম আমার বইয়ের দোকানটার কাছে। 'এগারোখানা বই আছে এখানে—সাড়ে বত্রিশ রুবল দাম। আমার আছে ত্রিশ রুবল আপনার আড়াই রুবল পয়সা আমাকে দিয়ে দিন—বইগুলো কিনে দুজনের পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া যাবে।' বুড়োর আনন্দ আর ধরে না, চাঁদি আর তামার মুদ্রাগুলি সে ঢেলে দিলে দোকানদারের হাতে। দোকানদারও সঙ্গে

সঙ্গে তার ঘাড়ে আমাদের নতুন কেনা গ্রন্থমালার বোঝাটি চাপিয়ে দিল। পকেটে আর বগলে বইগুলো ঢুকিয়ে বুড়ো প্রতিশ্রুতি দিলে, বইগুলো সে পরদিন আমার কাছে এনে দেবে চুপিচুপি। তারপর বাড়ি চলে গেল তার সম্পদ নিয়ে।

পরদিন বুড়ো তার ছেলেকে দেখতে এল। সেখানে যথারীতি ঘণ্টা খানেক থেকে এল আমাদের কাছে। বসলে যৎপরোনাস্তি একখানা হাস্যকর এবং রহস্যময় মুখভাব করে। হাসল নরম করে, গোপন কিছু একটা রহস্য জানা আছে এমনি ভাব করে হাত ঘষলে খুশিতে এবং জানালে যে বইগুলো সে গোপনে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, মাত্রিওনার হেফাজতে তা লুকিয়ে রাখা হয়েছে রান্নাঘরে। আলাপ চলল আসন্ন সুখানুষ্ঠান সম্পর্কে। সবিস্তারে বুড়ো বর্ণনা করলে, কি করে উপহারটি দেওয়া হবে। কিন্তু যতই কথা কইছিল বুড়ো ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে বুড়োর মনের মধ্যে কিছু একটা খোঁচা দিচ্ছে, সে কথা সে বলতে চায় না, হয়ত বলার সাহস নেই। আমি কিছু বললাম না, কিন্তু চেয়ে দেখলাম, বুড়োর খুশির ঝলক, তার হাস্যকর হাবভাব, মুখভঙ্গি, আর বাঁ চোখের মটকানির মধ্যে

থেকে ফুটে-ওঠা চাপা পরিতৃপ্তির আমেজটা ক্রমেই অদৃশ্য হচ্ছে এবং ক্রমেই অস্বস্তি আর উদ্বেগ বোধ করছে ও।

অবশেষে ভয়ে ভয়ে ফ্যাকাশে গলায় ও শুরু করলে, 'ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না, কি ভাবছি জানো, ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না?...' ক্রমেই খাপছাড়া হয়ে উঠছিল সে, 'মানে ব্যাপারটা হল এই: ধর তুমি যদি ওকে দশখানা বই দাও, মানে তোমার পক্ষ থেকে , তোমার নিজস্ব উপহার হিসেবে, তাহলে কেমন হয়? এগারো নম্বরেরটা দেব আমি, মানে আমার নিজস্ব উপহার বলে। তাহলে, মানে, তোমারও একটা উপহার দেওয়া হল, আমারও একটা উপহার দেওয়া হল—দুজনেই নিজের নিজের এক একটা উপহার দিলাম...' বলতে গিয়ে গোলমাল করে আর কিছুই সে বলতে পারল না। শুধু হতাশ হয়ে চেয়ে রইল আমার রায় শোনার জন্যে। জিগ্যেস করলাম, 'একসঙ্গে উপহার দেওয়াটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না কেন, জাখার পেত্রোভিচ্?' 'মানে, ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না, ব্যাপারটা হল এই... আসলে...' তোতলামি শুরু হয়েছিল ওর, কথা বেধে যাচ্ছিল, আর ভয়ানক লাল হয়ে উঠেছিল মুখচোখ।

অবশেষে সে বললে, 'ব্যাপারটা হল... আমি মাঝে মধ্যে একটু নেশা করি, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না, মানে, সবসময়েই হয়ত করি... মোটের ওপর ঠিক উচিত আচরণ আমি করি না — মাঝে মাঝে ধরো একটু ঠাণ্ডা লাগছে, কি কোনো একটা মুশকিলে পড়া গেছে, কি এমনিই মেজাজ ভালো লাগছে না, কিংবা কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে... মানে তখন বাড়তি কয়েক ফোঁটা না খেয়ে পারা যায় না আর কি। কিন্তু জানো তো, পেতেঙ্কা সেটা পছন্দ করে না। ভয়ানক রেগে যায় ও, বকাঝকা শুরু করে, নীতি উপদেশ দেয় — তাই ভাবছি, আমার উপহার দেখে ও বুঝবে যে আমি, মানে বলা যেতে পারে যে আমার অভ্যেস বদলাচ্ছি। ও টের পাবে যে অনেক দিন ধরে টাকাটা আমাকে জমাতে হয়েছে, কেন না পেতেঙ্কা যেটুকু দেয় তাছাড়া তো টাকা পাবার উপায় নেই আমার। ও জানে তা... মানে ও দেখে ভারি খুশি হবে যে টাকাটা এইভাবে খরচ করেছি, সবটা শুধু ওরই জন্যে জমিয়ে রেখেছি।

বুড়ো মানুষটা আমার দিকে এমন উদ্বেগ নিয়ে তাকাচ্ছিল যে ওর জন্যে দুঃখ হচ্ছিল আমার। অবিলম্বে মন ঠিক করে ফেললাম আমি।

বললাম, 'কিন্তু জাখার পেত্রোভিচ্, সবকটি বই-ই আপনি দিয়ে দিন না কেন!' 'সবকটি? মানে, কি বলছ, সব বইগুলো?' 'নিশ্চয়!' 'আমার নিজের উপহার হিসেবে?' 'হ্যাঁ।' 'মানে সবটাই যেন আমি দিচ্ছি এইভাবে?' 'সবটাই আপনার নিজস্ব উপহার হিসেবে!' খুলে বলা সত্ত্বেও বহুক্ষণ ধরে ব্যাপারটা যেন তার মাথায় ঢুকছিল না।

স্বপ্নাতুরের মতো বিড়বিড় করলে ও, 'তা যদি বলো, নিশ্চয় ভারি সুন্দর হয়—চমৎকার হয়। কিন্তু তোমার কি হবে, তুমি কি করবে, ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না?' বললাম, 'আমার পক্ষ থেকে কোনো উপহার দেব না, আবার কি হবে?' যেন ভয় পেয়েই ও চেঁচিয়ে উঠল, 'দেবে না! একেবারে কিছুই না?' হতভম্বের মতো ও সমস্ত প্রস্তাবটাই অগ্রাহ্য করতে চাইল, চাইল যাতে তার ছেলের জন্যে আমিও উপহার দিই। লোকটার মন ভালো! বুঝিয়ে বললাম, ওর ছেলেকে কিছু দিতে পারলে আমি খুশিই হতাম, কিন্তু ওর সাধ আমি নষ্ট করতে চাই না। বললাম, 'আপনার ছেলে আর আপনি যদি খুশি হন, তাহলে আমিও খুশি হব, আমি নিজে উপহার দিলে যেমন খুশি হতাম, তেমনি।'

এতে আশ্বস্ত হল সে। আরো ঘণ্টা দুই রইল আমাদের সঙ্গে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও স্থির হয়ে থাকতে পারল না। কেবলি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, কথা কয়ে, হেসে, সাশার সঙ্গে নেচে কুঁদে, অলক্ষ্যে আমায় চুমু খেয়ে, সুযোগ পেলেই হাতে চিমটি কেটে, এবং আন্না ফিওদরভ্‌না যখন দেখতে পাচ্ছে না তখন তাকে ভেঙচি দিয়ে চলল ও। আন্না ফিওদরভ্‌না অবশেষে ওকে বার করে দিলে। এমন হৈচৈ লোকটা কখনো আগে করেনি।

তারপর সেই শুভদিনটায় ঠিক এগারোটার সময় বুড়ো উদয় হল দরজার সামনে, এসেছে সোজা উপাসনা সভা থেকে, সযত্নে রিপুকরা টেলকোট গায়ে এবং সত্যি সত্যিই পরনে নতুন ওয়েস্ট কোট আর নতুন বুট। দুই হাতে তার বইয়ের দুটি মোড়ক। আন্না ফিওদরভ্‌নার ঘরে তখন আমরা সবে কফি খেতে বসেছি (সেদিনটা ছিল রবিবার)। পুশ্‌কিন খুব চমৎকার এক কবি এই প্রথম উক্তি দিয়ে ও শুরু করেছিল, কিন্তু বলেই কেমন ওর গুলিয়ে গেল এবং এলোমেলোভাবে এই মতামত ঘোষণা করে বসলে যে লোকের উচিত আচরণ করা উচিত, না করলে নেশার কবলে গিয়ে পড়তে হবে, এবং কু-প্রবণতাই হল মানুষের সর্বনাশের

কারণ। এইটে সে জোর দিয়ে জানাবার জন্য মদের কুফল সম্বন্ধে কয়েকটি মারাত্মক ঘটনা শোনালে, এবং বোঝালে যে কিছুকাল ধরে সে নিজেকে সংশোধন করছে, আচরণ তার এখন রীতিমতো খাসা। ওর ছেলে যে ন্যায্য কথা বলত, তা সে চিরকালই জানত—সে কথা সে মনে প্রাণে গ্রহণও করেছিল; এবং তার স্বভাবচরিত্রে সত্যকার উন্নতি হয়েছে, ঘটেছে অবিশ্যি এই সম্প্রতি। তার প্রমাণস্বরূপ এতদিন ধরে যে টাকা সে জমিয়েছে তা দিয়ে কেনা এই বইগুলি গ্রহণ করার জন্য বুড়ো ছেলেকে অনুরোধ জানালে।

বুড়োর কথা শুনতে শুনতে একই সঙ্গে হাসি আর কান্না পেল আমার। দরকার পড়লে কি রকম বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে লোকটা। বইগুলো তাঁর ছেলের ঘরে এনে শেল্‌ফে তুলে রাখা হল। আসল ব্যাপারটা টের পেতে অবশ্য পক্রোভ্‌স্কির দেরি হয়নি। দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবার জন্যে বুড়ো মানুষটাকে নেমন্তন্ন করা হল। কি ফুর্তিতেই না কেটেছিল সেদিন। খাওয়ার পরে আমরা তাস আর ফরফিট্‌ খেললাম। সাশার উৎসাহ আর ধরে না, আমিও কম গেলাম না। আমার দিকে মন পড়েছিল পক্রোভ্‌স্কির, একলা পেলে কথা বলার

চেষ্টা করছিল। আমি ওকে কিছুতেই সে সুযোগ দিচ্ছিলাম না। চার বছরে এই হল আমার সবচেয়ে সুখের দিন।

এবার শুরু করি দুঃখ-কষ্টের স্মৃতি-ভরা অন্ধকার দিনগুলোর কথা। বুঝি সেইজন্যেই আমার কলম চলছে আস্তে, যেন সরতে চাইছে না। হয়ত সেইজন্যেই আমি আমার সুখের দিনগুলোর কথা লিখেছি দরদ দিয়ে অত খুঁটিনাটি করে। সুখের দিন আমার ভারি অল্প আর তার পরেই শুরু হল এমন শোক আর দুঃখ, বড় দুঃখ, ভগবান জানেন কবে তার শেষ হবে।

আমার দুর্ভাগ্য শুরু হল পক্রোভ্স্কির রোগ আর মৃত্যুর সময় থেকে।

যে সব ঘটনার কথা বললাম, তার দু'মাস পরেই ও শয্যা নিয়েছিল। এই দু'মাস সে রোজগারের জন্যে খেটেছিল খুব। তখন পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত কাজ কিছু তার ছিল না। সমস্ত ক্ষয় রোগীদের মতো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওর আশা ছিল অনেক দিন বাঁচবে। শিক্ষকের কাজ তার মোটেই পছন্দ ছিল না। সে রকম পদ সে ইচ্ছে করলে পেতে পারত। তার স্বাস্থ্যের যা দশা তাতে সরকারী চাকুরি ছিল প্রশ্নের বাইরে। তাছাড়া, প্রথম বেতন পেতে হলেও তাকে অনেক দিন ধরে

অপেক্ষা করতে হত। মোটের ওপর, শুধু নৈরাশ্যের দিকটাই ওর চোখে পড়ছিল, কি রকম বাঁকা হয়ে উঠছিল ওর স্বভাব, স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছিল, যদিও সে মোটেই তা নজরে আনেনি। শরৎকাল এসে পড়েছিল। প্রায়ই সে বেরিয়ে যেত কেবল একটা পাতলা কোট পরে, কোনো একটা কাজের জন্যে দরখাস্ত লিখে, সুপারিশ নিয়ে, এতে নিজেকে ভারি হীন লাগত তার। বারবার বৃষ্টিতে নেয়ে এবং ভেজা পায়ে ঘুরে অবশেষে সেই যে ও শয্যা নিল, আর উঠল না ... শরতের ঠিক মাঝখানে ও মারা গেল— অক্টোবরের শেষের দিকে।

সারা অসুখটা আমি ওর ঘর ছেড়ে প্রায় যাইনি; ওর দেখাশুনা করেছি এবং প্রায়ই জেগে থেকেছি সারা রাত। সারাক্ষণ ওর মন ঘুরে বেড়াতো চারিদিকে, প্রায়ই বকবক করত, ঈশ্বর জানেন কি সে না বলত; বইগুলোর কথা, চাকরি খোঁজার কথা, আমার কথা, ওর বাপের কথা ... আমি যা জানতাম না, কখনো ভাবিওনি, এমন অনেক কথা। ওর অসুখের প্রথম প্রথম বাড়ির সকলে আমাকে লক্ষ্য করত কেমন অদ্ভুতভাবে চেয়ে চেয়ে, আন্না ফিওদরভ্‌না মাথা নাড়তেন মাঝে মাঝে। কিন্তু আমি শান্তভাবে ওদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতাম, ফলে

ক্রমশ আমার সম্পর্কে ওদের ভর্ৎসনার পালা শেষ হল, অন্তত মায়ের।

মাঝে মাঝে আমাকে চিনতে পারত পক্রোভ্স্কি, যদিও তা নেহাৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ। প্রায় সবসময়েই ভুল বকত সে। মাঝে মাঝে মনে হত, কার সঙ্গে যেন ও দীর্ঘ অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে সারা রাত ধরে; ছোট্ট ঘরখানায় ওর ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজ কেমন অদ্ভুত আর ফাঁপা ফাঁপা লাগত, যেন মাটির তলায় খিলানের নিচে কেউ কথা কইছে। ভারি ভয় করত আমার। শেষ রাতটা বিশেষ করে ওর বিকার দেখা দিল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল ও। সে গোঙানিতে বুক ভেঙে যাচ্ছিল আমার। সকলেই ভয় পেয়ে গেল। আন্না ফিওদরভ্না ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, তাড়াতাড়ি যাতে শেষ হয়ে যায়। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার বললে, সকাল পর্যন্ত টিকে থাকবে, তারপরেই শেষ।

বুড়ো পক্রোভ্স্কি রাত কাটালে বারান্দায় ছেলের ঘরের দরজার কাছে, সেখানে একটা ছালা পেতে দেওয়া হয়েছিল ওর জন্যে। কেবলি ঘরের মধ্যে এসে ঢুকছিল ও, চেহারা হয়ে উঠেছিল ওর ভয়ানক, বুকটা যেন ভেঙে গেছে। হতভম্ব আর মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল

শোকে। ভয়ে তার মাথাটা নড়বড় করছিল, সারা শরীর কাঁপছিল, সারাক্ষণ ও বিড়বিড় করে নিজের মনেই বকে যাচ্ছিল কি যেন। মনে হচ্ছিল শোকে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

ঠিক ভোরের আগে ক্লান্তিতে ও নেতিয়ে পড়ল মড়ার মতো ঘুমে। সকাল সাতটার কিছু পরেই বোঝা গেল মরণ কাছে এসেছে। বাপকে জাগিয়ে দিলাম আমি। মৃত্যুপথ যাত্রীর পুরো জ্ঞান ফিরে এসেছে তখন। আমাদের সকলের কাছ্ থেকে বিদায় নিলে ও। আশ্চর্য! আমি কাঁদতে পারলাম না, যদিও বুক আমার ভেঙে যাচ্ছিল।

কিন্তু শেষ মুহূর্তগুলোই হয়ে উঠল অসহ্য। জড়িত উচ্চারণে কিসের জন্যে যেন ও মিনতি করছিল, কিন্তু কথাগুলো কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না আমি। আর সইতে পারছিলাম না। বুক আমার ভেঙে যাচ্ছিল। এক ঘণ্টা ধরে ও ছটফট করলে, আভাসে ইঙ্গিতে কি যেন বলার চেষ্টা করলে আমায়। তারপর অস্পষ্ট ভাঙা ভাঙা করুণ গলায় আবার কি যেন মিনতি করলে। এবারও তার একবর্ণও বুঝে উঠতে পারলাম না আমি। এক এক করে সকলকেই ওর শয্যার কাছে নিয়ে এলাম। একটু

জল দিলাম খেতে। করুণভাবে ও শুধু মাথাটা নাড়লে। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, কি ও চাইছে। পর্দাটা তুলে দেবার জন্যে আমায় মিনতি করছে ও—দিবালোক আর সূর্য আর ঈশ্বরের এই পৃথিবীটাকে ও শেষ বারের মতো একটু দেখবে। পর্দা তুলে দিলাম। কিন্তু ঘরের বাইরের প্রত্যূষটা তখন নির্বানোন্মুখ জীবনখানার মতোই দীন আর নিষ্প্রভ আর বিষণ্ণ। রোদ নেই কোথাও। কুয়াশার পর্দার মতো মেঘে ঢাকা আকাশ। ভারি করুণ আর নিচু হয়ে যেন ঝুলে পড়েছে। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে জানলার শার্সির ওপর, ঠাণ্ডা ময়লা জলের রেখা নেমে আসছে সেখান থেকে, ছায়াচ্ছন্নতা যেন আরো ঘনিয়ে উঠেছে। আলোর আঙুলগুলো এসে বুঝি আইকন-দীপের কম্পিত শিখাটাকেই নিশ্চিহ্ন করতে চায়। একবার সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল ও। পর মুহূর্তেই মারা গেল সে।

সৎকারের ব্যবস্থা করলেন আন্না ফিওদরভ্না। অত্যন্ত সাদামাটা গোছের একটা কফিন কেনা হল, ভাড়া করা হল মামুলী একটা গাড়ি। এর খরচা তোলার জন্যে আন্না ফিওদরভ্না মৃতের বইপত্তর এবং অন্যান্য জিনিসপাতি দখল করে বসলে। বুড়ো এই নিয়ে ওর সঙ্গে ভয়ানক

ঝগড়া বাধালে, যত পারল বই উদ্ধার করে পকেট আর টুপি বোঝাই করে ভরলে। তিন দিন ধরে বইগুলো সে হাতছাড়া করলে না, গির্জাতেও সেগুলো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। এই সময়টা বুড়ো ভারি অসহায় আর হতভম্ব হয়ে ছিল। অদ্ভুত সন্তর্পণে সারাক্ষণ ও ঘুর ঘুর করত কফিনের চারপাশে, কখনো মৃতের উপরে ভেনচিকটা* ঠিক করে দিত, কখনো বাতিগুলোকে জ্বালিয়ে উস্কিয়ে দিত। কোনো একটা কিছুতে বেশিক্ষণ ওর চিন্তা স্থির হয়ে থাকতে পারত না। মা অথবা আন্না ফিওদরভ্না, দুজনের কেউই গির্জার উপাসনায় যেতে পারেননি। মা'র শরীর ভালো ছিল না। আন্না ফিওদরভ্না আসছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বুড়ো পক্রোভ্স্কির সঙ্গে ঝগড়া বেধে যাবার ফলে মত পরিবর্তন করলেন। উপাসনায় হাজির ছিলাম শুধু আমি আর বুড়োটা। উপাসনা যখন চলছে, তখন হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক হতে লাগল আমার। উপাসনার শেষ পর্যন্ত আর তর সইছিল না। অবশেষে কফিন বন্ধ করে, স্ক্রু এঁটে,

* ভেনচিক—গ্রীক চার্চের প্রথা অনুসারে মৃতের মাথার ওপর ন্যস্ত মুকুট।

গাড়িতে চাপিয়ে যাত্রা শুরু হল। গাড়োয়ান ঘোড়াগুলোকে ছুটাল কদমে। রুদ্ধশ্বাসে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুড়ো ছুটছিল গাড়ির পেছনে পেছনে। টুপি উড়ে গিয়েছিল বুড়োর, কিন্তু থেমে সেটাকে কুড়িয়ে নেবারও সময় ছিল না তার। বৃষ্টিতে চুল শপ শপ করছে ওর, কড়া বাতাসের ঝাপটা এসে পড়ছে মুখেচোখে। কিন্তু কিছুই যেন বুড়োর খেয়াল নেই, গাড়িখানার এপাশে ওপাশে কেঁদে কেঁদে ও ছুটতে লাগল। আর উড়তে থাকল ওর পুরনো কোটের টেল। আর সবকটি পকেট থেকে মুখ বাড়িয়ে ছিল ওর সেই বইগুলো। সবচেয়ে বড়ো বইটা বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরা। রাস্তার লোকেরা টুপি খুলে ক্রুশ করে নিচ্ছিল। বেচারা বুড়ো মানুষটার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখছিল না থেমে। পকেট থেকে বইগুলো পড়ে পড়ে যাচ্ছিল কাদার মধ্যে। ওকে থামিয়ে তা দেখিয়ে দিলে, ও নিচু হয়ে সেগুলোকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই আবার ছুট দিচ্ছিল গাড়ির পাল্লা ধরবার জন্যে। রাস্তার কোণ থেকে কে একটা বুড়ী এসে সঙ্গ ধরল ওর। মোড়ের আড়ালে গাড়িখানা অদৃশ্য হয়ে গেলে আমি বাড়ি ফিরে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠলাম সজোরে। মা-ই এখন আমার অবশিষ্ট শেষ আপন

জন। তাকে আড়াল করে রাখার জন্যেই যেন মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুক দিয়ে ঢেকে চুমু খেতে লাগলাম। কিন্তু মরণ আগেই তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে!...

১১ই জুন

গতকাল চরে বেড়িয়ে নিয়ে এলে তার জন্যে ভারি কৃতজ্ঞ, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। সত্যি কি সুন্দর, কি সবুজ আর তাজা! কতদিন এমন গাছ আর ঘাস দেখিনি। অসুখের সময় মনে হয়েছিল বুঝি আর তা দেখা হয়ে উঠবে না। তাই কালকে কি রকম যে আমার লেগেছিল, তা কল্পনা করে নিয়ো! অমন মনভার ছিল বলে দুঃখ কোরো না কিন্তু। সত্যিই ভারি আনন্দ পেয়েছিলাম আমি, মন হালকা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কেমন জানি সবচেয়ে সুখের মুহূর্তেই বিষণ্ন লাগে আমার। কান্নাটাও কিছু নয়। প্রায়ই কান্না পায় আমার, কেন কে জানে। যাই ঘটুক এত অল্পেই ব্যথিত লাগে নিজেকে—চিরকালই আমার অনুভূতিগুলো বড়ো বেদনার। বিবর্ণ নির্মেঘ আকাশ, পাটে বসা সূর্য, নিথর সন্ধ্যে—মানে কি যে বলি জানি না, কেমন একটুতেই আকুল হয়ে

ওঠার ভাব পেয়ে বসেছিল আমাকে, মনভার হয়ে কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু কেনই বা লিখছি এ সব? নিজের মনের কাছেই জিনিসটা যা অস্পষ্ট, কাগজের বুকে সে তো আরোই অর্থহীন, কিন্তু তুমি হয়ত বুঝবে। হাসি আর কান্না! কি ভালো, কি দরদী তুমি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। কাল তুমি যখন আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলে, তখন বেশ টের পেয়েছিলাম, তুমি যেন আমার চোখের ভাষা ধরতে চাইছ, আমার সুখের স্বাদ পেতে চাইছ। একটা ঝোপ, একটা কচি চারা, এক সার তরু-বীথি অথবা এক চিলতে জল—যাই দেখি, তুমি এমন ভাবে সগর্বে আমার দিকে চেয়ে থেকেছ, যেন এ সব তোমারই জিনিস। এ থেকে বোঝা যায় কত নরম তোমার মন। আর সেই জন্যেই তোমায় ভালোবাসি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। এবার আসি। আজকে আবার শরীরটা ভালো নেই। কালকে পা ভেজা ছিল, ঠাণ্ডা লেগে গেছে। ফেদোরাও ভালো নেই, দুজনেই আমরা অকর্মণ্য। ভুলে যেয়ো না আমাদের, যত পারো, এসো।

তোমার

ভ. দ.

১২ই জুন

আদরের ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না!

কি ভাবছিলাম জানো, তোমার কালকের চিঠিখানা হবে নিশ্চয়ই কবিতায়—কবিতার চেয়ে এক ছিটে কম নয়! কিন্তু তার বদলে তুমি লিখলে শুধু ছোট্ট একটিমাত্র পাতা। মানে বলতে চাইছি যে যদিও লিখেছ্‌ অল্প, তবু লেখাটা ভারি ভালো, ভারি চমৎকার। প্রকৃতি, এবং নানাবিধ গ্রামের দৃশ্যপট, ভাব-অনুভূতি—মোটের ওপর সবকিছুই খুব সুন্দর করে বর্ণনা করেছ্‌। আর আমার কথা তো জানো, প্রতিভা আমার নেই। এক ডজন পাতা লিখলেও কিচ্ছু কাজে দেবে না। লিখে দেখেছি। তুমি লিখেছ্‌, আমার মনটা নরম, নিরীহ; কাউকে দুঃখ দিতে আমি পারি না। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের যে শিবময় করুণাঘন প্রকাশ তাতে আমি সাড়া দিই, এবং আরো অনেকভাবে তুমি আমার প্রশংসা করেছ্‌। এ সবই সত্যি কথা আমার রাণী, খাঁটি সত্যি। ঠিক যেভাবে আমার বর্ণনা দিয়েছ্‌ আমি হুবহু তাই। নিজেই আমি তা জানি। তবু তুমি যা লিখেছ্‌, তা পড়তে পড়তে মন গলে যায়, বিষণ্ণ যতো ভাব

আর ভাবনা ফিরে ফিরে আসে। তাই নিজের কথা তোমায় আজ আমি কিছু শোনাব।

আপিসে যখন প্রথম কাজে যোগ দিই তখন আমার বয়স সতেরো। সে কম করে তিরিশ বছর আগের কথা। আপিসে যাবার অনেক কটি কোট আমি এই সময়ের মধ্যে পরে পরে জীর্ণ করেছি, এ কথা বলতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে বয়সও বেড়েছে, বুদ্ধিও বেড়েছে আমার, সংসারের বেশ কিছুটা দেখেছি। জীবন কাটিয়েছি বটে, সন্দেহ নেই। এমন কি এক সময় ওরা আমাকে পুরস্কারের জন্যে সুপারিশ পর্যন্ত করেছিল। তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী। তবে দুর্ভাগ্য কি জানো, মন্দ লোকের হাত থেকে নিস্তার নেই যে! হয়ত আমি একটি মূর্খ, নিতান্ত নির্বোধও হতে পারি, কিন্তু অন্তঃকরণ আমার কারো চেয়ে কম নয়। তা সেই মন্দ লোকটা কি করল জানো আমাকে? বলতেও লজ্জা হয়—কেন করল তাই বরং বলি। করল শুধু এই দেখে যে আমি একটু ভীরু গোছের লোক, চুপচাপ থাকি, মনটা আমার নরম। আমাকে ওরা পছন্দ করত না, এই হল কারণ। শুরু করল ছোটোখাটো খুঁত ধরে, 'মাকার আলেক্সেয়েভিচ্ হল গে এমন, তেমন, সাত

সতেরো!' তারপর শুরু হল, 'মাকার অলেক্সেয়েভিচ্ করেছে তো, তার কাছ থেকে আর কি আশা করা সম্ভব?' এবং শেষ কালে, 'কার দোষ? নিশ্চয় মাকার আলেক্সেয়েভিচের!' মানে, বুঝলে তো ভারেঙ্কা, দাঁড়াল এই যে যত দোষ সব মাকার অলেক্সেয়েভিচের। ওই হল ওদের ফিকির: সারা দপ্তরে মাকার আলেক্সেয়েভিচের নামটা বদ্‌নাম করে চালু করে দাও। কিন্তু তাতেও ওদের তুষ্টি হল না। আমি যে বুট পরি, আপিসের যে কোট গায়ে দিই, আমার চুলের পাট, এমন কি আমার চেহারা পর্যন্ত নিয়েও কথা রটতে লাগল। এ সবই নাকি বিদঘুটে, বদলানো দরকার। এমনি চলল বছরের পর বছর এবং যত দূর আমার মনে পড়ে, প্রতিটি দিন। এখন সেটা আমার অবশ্য সয়ে গেছে, চুপচাপ নগণ্য লোক আমি, সবই আমার কাছে সয়ে যায়। তবু, কেন এ সব সইতে হল আমাকে, কি আমার অপরাধ? আমি কি আগু বেড়ে অন্য কারো প্রমোশন বেদখল করে নিয়েছি? নাকি, ওপরওয়ালার কাছে কারো নামে চুকলি কেটেছি কখনো? না, মাইনে বাড়াবার জন্যে ঝগড়াঝাঁটি করেছি, নাকি কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি। এ সব কথা কল্পনাও করিনি

কখনো। কেনই বা করব ও সব? ভেবে দেখো, লক্ষ্মীটি, দুরাশা পোষণ করা এবং লোক ঠকানোর মতো বুদ্ধি কি আমার আদৌ আছে? ভগবানের দোহাই, কি করেছি যে আমার পেছনে এমন করে লাগবে... তোমার চোখে আমি ভালো লোক, তাই না! কিন্তু সাধারণ লোকের চেয়ে তোমার মনটা অনেক ভালো। তাছাড়া, সবচেয়ে বড়ো নাগরিক গুণ কাকে বলবে? কাল একটা ব্যক্তিগত আলাপের মধ্যে এভ্স্তাফি ইভানভিচ্ বলছিলেন যে সবচেয়ে বড়ো নাগরিক গুণ হল দু'হাতে টাকা করা। এভ্স্তাফি ইভানভিচ্ অবশ্য ঠাট্টা করছিলেন (আমার দৃঢ় ধারণা উনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেছিলেন)। কিন্তু কথাটার পেছনকার নীতি-উপদেশ হল এই যে কারো গলগ্রহ হয়ে থাকা উচিত নয়—আমি কারো গলগ্রহ নই। নিজের খাবার রুটিটুকু আমার বাসি হতে পারে, কিন্তু সেটা আমার সৎভাবেই উপার্জন করা, এবং আইনসঙ্গত ভাবেই তা আমি খাই। মানুষের পক্ষে আর কি করার আছে? নথিপত্র নকল করার মধ্যে খুব একটা দক্ষতা নেই হয়ত, তবু এই আমার গর্ব যে আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই কাজ করি। তাছাড়া, নথিপত্র নকল করার কাজে দোষ কি? সেটা কি অপরাধ? 'ওই দেখো,

বসে বসে নকল করছে!’ ‘আপিসের ধেড়ে ইঁদুরটা নকল করতে বসেছে!’ এ সব কথা কেন? এর মধ্যে অন্যায়টা কি? আমার হাতের লেখা পরিষ্কার, দেখতে সুন্দর, হুজুর সবসময় দেখে খুশি হন। সবচেয়ে জরুরী কাগজগুলো হুজুরের জন্যে নকল করে দিই আমিই। স্টাইলের কথা ধরলে ও আমার নেই। সে আমি ভালো করেই জানি, সেই জন্যেই চাকরির উন্নতি করতে পারিনি। এমন কি তোমার কাছেও, ভারেঙ্কা, যখন লিখি যেমন এখন লিখছি, তখনো ভাব দিয়ে সাহিত্য করে লিখি না, যা মনে আসে লিখে যাই। সে আমি খুবই জানি, কিন্তু জিগ্যেস করতে চাই, সকলেই যদি রচনা করার কাজ নেয় তাহলে কি দাঁড়াবে? নকল করার কাজটা কে করবে তখন? কি তার জবাব? জবাব নেই, ভারেঙ্কা। তার মানে আমারও দরকার আছে— আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে খোঁচা দেবার মানে হয় না। ‘আপিসের ধেড়ে ইঁদুর’ বলে যদি ওরা সুখ পায়, যদি ইঁদুরের মতোই আমায় দেখায় তো বলুক, কিন্তু এটা কি ওরা দেখতে পাচ্ছে না যে ধেড়ে ইঁদুরটারও দরকার আছে, ধেড়ে ইঁদুরটাও কাজ দিচ্ছে, ধেড়ে ইঁদুরটার কাজ-ই তারিফ পাচ্ছে, এবং তাকেই

মাইনে দেওয়া হচ্ছে? যেমন তেমন ধেড়ে ইঁদুর আমি নই! যাক, ইঁদুরের কথা যথেষ্ট হয়েছে। বলব বলে ভাবিনি, কিন্তু হঠাৎ মেজাজ বিগড়ে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে একটু ঝাল ঝাড়া ভালো। এবার বিদায় ভারেঙ্কা, আমার সান্ত্বনার ছোট্ট পাখিটি! আদরের দেবী আমার, শীগগিরই তোমায় দেখতে যাব, ভেবো না। ইতিমধ্যে নিঃসঙ্গ ভাবটা কাটাতে চেষ্টা কোরো। একটা বই-ও নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বিদায়, ভারেঙ্কা।

তোমার অকৃত্রিম শুভাকাংক্ষী,

মাকার দেভুশ্‌কিন

২০শে জুন

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

তাড়াতাড়ি করে লিখছি, কেন না হাতের কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে ঠিক সময়ের মধ্যে। শোনো বলি, ভারি একটা দাঁওয়ের সম্ভাবনা আছে। ফেদোরা বলছে কে যেন একটা নতুন ইউনিফর্ম বিক্রি করতে চায়— ট্রাউজার, ভেস্ট, টুপি সমেত পুরো ইউনিফর্ম, বেশ

নতুন এবং সস্তাও। তুমি কেনো না কেন। তোমার অবস্থা এখন একটু ভালো। তুমি তো নিজেই বলো, টাকা আছে। দোহাই তোমার জিনিসটা একান্ত দরকারী যে। নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখো, কি পোষাক পর তা একটু দ্যাখো তো। কি রকম যে জীর্ণ, লজ্জা করা উচিত। নতুন বলতে কিছুই নেই তোমার। যতই বলো আছে, আমি নিশ্চয় জানি নেই। তোমার নতুন ইউনিফর্মটা তুমি যে কি করেছ, ভগবানই জানেন। তাই সত্যি, দয়া করে মন ঠিক করে ফ্যালো, আমার জন্যেই না হয় কোরো, তুমি যে আমায় ভালোবাস তা দেখাও।

আমার জন্যে তুমি কিছু ছিট উপহার পাঠিয়েছ, কিন্তু নিজেকে তুমি একেবারে ধ্বংস করতে শুরু করেছ। আমার জন্যে যে করে তুমি টাকা খরচা করো দেখে ভয় লাগে। কি ভীষণ খরুচে লোক তুমি। আমার দরকার নেই। ও জিনিসগুলো সত্যিই খুব দরকারী নয়। আমি জানি, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি আমায় ভালোবাস। উপহার পাঠিয়ে পাঠিয়ে সে কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবার কোনো দরকার নেই, বিশেষ করে যখন তা গ্রহণ করা আমার পক্ষে অত কঠিন। আমি যে

জানি, তার জন্যে তোমায় কি মূল্য দিতে হচ্ছে। তোমায় মিনতি করে বলছি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, এই শেষ, আর যেন অমন উপহার পাঠিয়ো না। পাঠাবে না তো?

আমি তোমায় যে লেখাটা পাঠিয়েছিলাম, সম্পূর্ণ করে তার শেষটুকু পাঠাবার জন্যে লিখেছ, কিন্তু সত্যি বলতে কি কি করে যে অতখানি লিখতে পেরেছিলাম, তাই ভেবে পাচ্ছি না। অতীতের কথা বলা, এমন কি সে সম্পর্কে ভাবাও আমার কাছে এখন অসহ্য। পেছনে ফিরে তাকাতে বড়ো ভয় করে আমার। সবচেয়ে কষ্ট লাগে বেচারী মায়ের কথা বলতে, দানবের হাতে তিনি মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে গেছেন। ভাবতেও হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। এখনও সবকিছু এত তাজা যে এক বছর পেরিয়ে গেলেও আত্মস্থই হতে পারিনি, মনের শান্তি ফিরে পাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু তুমি তো সব জানো।

তোমায় বলেছি আন্না ফিওদরভ্না এখন কি ভাবছেন। আমায় তিনি অকৃতজ্ঞ বলে গাল দিচ্ছেন, বীকভের কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর যে কোনো সংস্রব ছিল সে কথা তিনি বেমালুম অস্বীকার করছেন। তিনি চান, আমি ফিরে যাই। বলছেন, ভিক্ষার অন্নে আমি দিন কাটাচ্ছি, বিপথে চলেছি। বলছেন, ফিরে গেলে বীকভের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করবেন আর আমার সামনে

তাঁকে দোষ স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। বলছেন, শ্রীযুক্ত বীকভ আমায় ভালো যৌতুক দিতে চান। ঈশ্বর ওঁকে ক্ষমা করুন! তুমি আর আমার দরদী ফেদোরার সঙ্গে এখানে আমি অনেক সুখে আছি। ফেদোরাকে দেখে আমার মনে পড়ে যায় ধাই-মার কথা। আত্মীয় হিসাবে তুমি অনেক দূরের, তবু তোমার নামটা আমাকে বাঁচাচ্ছে। ওদের কথা যদি বলো—ওদের পরিচয় আমার দরকার নেই, পারলে ওদের আমি ভুলে যেতে চাই। আমাকে নিয়ে ওদের এখনো কিসের দরকার! ফেদোরা বলে, সবটাই নাকি গুজব, আমাকে ওরা আর ঘাঁটাবে না। ঈশ্বর করুন যেন তাই হয়!

ভ. দ.

২১শে জুন

আদরের ছোট্ট রাণী আমার!

কি করে শুরু করব জানি না। আমরা এই যে এই রকম ভাবে বাস করছি ভাবতে কি অদ্ভুতই না লাগছে। এমন সুখের দিন আমার কখনো আসেনি। মনে হচ্ছে, ভগবান যেন আমায় ঘর-সংসার জুটিয়ে দিলেন।

সত্যি, আমার আদরের অনাথিনী! যে চারটে ব্লাউজ পাঠিয়েছি তা নিয়ে অমন করছ কেন? ও যে তোমার দরকার, ফেদোরা আমায় বলেছিল। তোমায় কিছু দিতে পারলে যে সুখ, সে যে আমার, একান্ত আমারই এক সুখ। সে সুখে তুমি বাধ সেধো না, ভারেঙ্কা। কেন আঘাত দিতে চাও বলো তো, কেন মন খারাপ করে দিতে চাও? জীবন আমার কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আমি এখন বাঁচি দুজনের জন্যে—তোমার জন্যে আর আমার জন্যে। দ্বিতীয়ত, ভদ্রসমাজে যাতায়াত করাও শুরু করলাম বলে। আমার প্রতিবেশী রাতাজ্যায়েভ—সেই যে অফিস-কর্মচারীটি সাহিত্য-বাসরের আয়োজন করেন, তিনি আমাকে আজ সন্ধ্যেয় চায়ে নেমন্তন্ন করেছেন। এ সভায় সাহিত্য পাঠ করা হবে। এ রকমই চলছে এখন আমাদের, দেখছ তো। এখন আসি, বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়াই চিঠিখানা লিখলাম—শুধু তোমাকে এই কথাটা জানাতে যে আমি ভালো আছি। তেরেসার মারফত জানলাম, যে এম্ব্রয়ডারির জন্যে তোমার কিছু রঙীন সিল্কের সুতো দরকার। কিনে দেব, নিশ্চয়ই কিনে দেব তোমায়। কালকের মধ্যেই তোমার ইচ্ছে

পূর্ণ হবে, আমার আদরিণী। কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, তাও আমার জানা আছে।

তোমার অকপট বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

২২শে জুন

প্রিয় ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না!

আমাদের বাড়িতে একটা ভারি করুণ, অতি অতি করুণ একটা দুর্ঘটনার কথা তোমায় জানাই। আজ ভোর চারটের কিছু পরেই গর্‌শ্‌কোভদের ছোটো ছেলেটা মারা গেছে। কিসে মারা গেল, স্কার্লেট জ্বর, নাকি অন্য কিছুতে বলতে পারি না। ওদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে গিয়েছিলাম। সত্যিই কি গরিবের মতো ওরা থাকে, ঘরখানাও কি নোংরা! তাতে অবাক হবার কিছু নেই: ওরা সকলেই বাস করে একই ঘরে, শালীনতা বজায় রাখবার জন্যে শুধু কয়েকটা পর্দা টাঙিয়ে ভাগ ভাগ করা। কফিন তৈরিই ছিল—সাদামাটা একটা কফিন, কিন্তু বেশ পরিপাটী। রেডি-মেড্ অবস্থাতেই ওটাকে কিনে এনেছিল। ছেলেটার নয় বছর বয়েস, লোকে

বলে বেশ প্রতিশ্রুতি ছিল ছেলেটার। ওদের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল, ভারেঙ্কা। মা কাঁদছিল না বটে, কিন্তু ভারি নেতিয়ে পড়েছিল। খাওয়াবার মতো একটা পেট কমল দেখে হয়ত ওরা সত্যিই স্বস্তি পাচ্ছিল। আরো দুটি আছে: একটা কোলের আর একটা বছর ছয়েকের ছোটো মেয়ে। বাচ্চাদের কষ্ট চেয়ে দেখা সত্যিই কঠিন — বিশেষ করে আবার সে যদি হয় নিজেরই বাচ্চা, অথচ সাহায্য করার কোনো উপায় নেই। পুরনো তেলতেলে ফ্রক-কোট পরে বাপটা বসেছিল একটা ভাঙা চেয়ারে। গাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল চোখের জল। হয়ত শোকের জন্যে ঠিক নয়, অভ্যেসবশে। চোখে ওর কি একটা যেন হয়েছে। লোকটা অদ্ভুত গোছের! কথা কইলে সঙ্কোচে কেমন লাল হয়ে ওঠে, এলোমেলো হয়ে গিয়ে কথা আটকে যায়। ওর সেই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল কফিনে ঠেস দিয়ে। দেখাচ্ছিল কেমন ধূসর, বেচারার মতো, কি যেন ভাবছিল। ঐটুকু বয়সে অমন ভাবনা, এ দেখতে ইচ্ছে করে না, আমার ভারেঙ্কা। কেমন বিছছিরি লাগে! মেয়েটার ন্যাকড়ার পুতুলটা অবহেলায় পড়ে ছিল মেঝের ওপর। ঠোঁটের ওপর আঙুলটা নাড়তে নাড়তে ও দাঁড়িয়েছিল কি রকম

আচ্ছন্নের মতো, কি রকম ভয়ানক স্তব্ধ। আমাদের বাড়িউলী ওকে একটা মিষ্টি দিলে। মেয়েটা নিলে, কিন্তু খেলে না। মন ভারি খারাপ লাগছে, ভারেঙ্কা।

মাকার দেভুশ্‌কিন

২৫শে জুন

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

তোমার বইটা ফেরত দিলাম, বিশ্রী বই, একেবারে অখাদ্য! এমন রত্ন কোথা থেকে তুমি খুঁজে পেলে? হাসির কথা নয়, তুমি সত্যিই এই রকম বই পছন্দ করো নাকি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্? সেদিন বলেছিলে, পড়বার মতো কিছু পাঠাবে। দুজনে পড়ব। আপাতত বিদায়। বেশি লেখার সময় নেই।

ভ. দ.

২৬শে জুন

প্রিয় ভারেঙ্কা!

সত্যি কথা বলতে, ও বইখানা আমি পড়িনি। কয়েক পাতা পড়ে দেখলাম যে সবই নিতান্ত লোক

হাসাবার মতো চাপল্যে ভরা, তাই মনে হল সত্যিই বুঝি মজাদার কিছু হবে। ভাবলাম, হয়ত বা ভারেঙ্কার ভালো লাগবে। তাই পাঠিয়েছিলাম।

যাই হোক, রাতাজ্যায়েভ বলেছে সত্যিকারের সাহিত্য কিছু আমাকে দেবে। পড়বার মতো ঢের বই তুমি পাবে, ভারেঙ্কা। রাতাজ্যায়েভ লোকটার ভেতরে জিনিস আছে—সত্যিই পণ্ডিত ব্যক্তি। নিজেও ও লেখে। আর কি সুন্দরই না সব লেখা! লোকটার কলম চলে বটে, লেখার মধ্যে কি করে স্টাইল লাগাতে হয় বেশ জানে—মানে প্রতিটি কথায় তার স্টাইল—এমন কি ফালদোনি কি তেরেসার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি যে সব তুচ্ছ ফাঁকা কি মামুলী কথা বলে থাকি, ও বলতে গেলে তার মধ্যেও স্টাইল ভরে দেবে। ওর আড্ডায় আমি অনবরত যাই। বসে বসে আমরা ধূমপান করি, আর ও তার লেখা পড়ে শোনায়—মাঝে মাঝে পাঁচ ঘণ্টাও পেরিয়ে যায়। সাহিত্যের উৎসব আর কি! অপূর্ব! ঠিক যেন ফুল! প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন তোড়া বাঁধা! লোকটার মনটাও খুব ভালো, ভারি বিবেচক, বিনীত! ওর সঙ্গে আমার তুলনা? আমি তো কিছুই নই! ওর নাম-ডাক আছে। আর আমার? কিছুই নেই। ধর্তব্যের

মধ্যেই আমি নই! তবু আমাকে বেশ প্রশ্রয় দেয় ও। মাঝে মাঝে ওর জন্যে কিছু একটা নকল করে দিই। ভেবো না কিন্তু, এটা মাত্র একটা মতলব। আমাকে ও প্রশ্রয় দেয় শুধু ওর কিছু নকল করার কাজ করিয়ে নেবার জন্যে তা ভেবো না। ওটা নিতান্তই একটা বাজে গুজব, ভারেঙ্কা, একেবারে মিথ্যে রটনা! কাজটা আমি করে দিই, কারণ সত্যিই ও কাজ ভালো লাগে আমার, আমাদের আনন্দের জন্যেই। ও প্রশ্রয় দেয় সেইজন্যেই—আমি যাতে একটু আনন্দ পাই সেইজন্যে। সূক্ষ্ম কিছু একটা দেখলে তা তারিফ করার মতো বোধ আমার আছে। বেশ ভালো, সহৃদয় লোকটা, সত্যি, আর চমৎকার লেখক!

সাহিত্য জিনিসটা অপূর্ব ভারেঙ্কা, সত্যি অপূর্ব! গত পরশু এইটেই আমি টের পেলাম ওদের কাছ্ থেকে। ভারি গভীর একখান জিনিস! ওদের সব বইয়ের মধ্যে মনের উন্নতি করা, মনকে শক্ত করা এবং এই রকম আরো কত কি না পাওয়া যায়। আর কি চমৎকার করেই না লেখা! সাহিত্য হল্ একটা ছবি, মানে এক ধরণের ছবি আর দর্পণের মতো। এতে আবেগ প্রকাশ পায়, সূক্ষ্ম সমালোচনা আর উপদেশও তাতে থাকে,

এবং জীবনের ইতিবৃত্তও বটে। এ সব আমি ওদের কাছ থেকে পেলাম। খোলাখুলি বললে, ওখানে বসে বসে আমি শুনি আর পাইপ টানি (অন্য সকলের মতো করেই পাইপ টানতে পারি বোধ হয়), কিন্তু যেই ওরা হরেক রকম জিনিস নিয়ে তর্ক শুরু করে, অমনি আমি আর খেই পাই না, ভারেঙ্কা। ও সব আমার বোঝার কর্ম নয়। বোদ্ধার মতো ভাব করার চেষ্টা অবশ্যই করি, কিন্তু সত্যিই ভারি লজ্জা করে। নীরেট কাঠের মতো সারা সন্ধ্যে বসে বসে যুৎসই একটা কথা মনে করার চেষ্টায় মাথা খুঁড়ে মরা। যেন চক্রান্ত করেই সে কথাটা কিছুতেই মনে আসবে না আমার! এত দুঃখ হয়, ভারেঙ্কা, কিছুতেই ঠিক ওদের যোগ্য হতে পারছি না বলে। সেই যে কথায় বলে না: বোকার বোকা ধেড়ে বোকা। অবসর সময়ে আমি কিই বা করি। চ্যালা কাঠের মতো পড়ে পড়ে ঘুমোই। কিন্তু কি করা উচিত আমার? বেশ রুচিময় কিছু একটা আমার করা উচিত তো। বসে বসে কিছু লেখার চেষ্টা করা তো উচিত। তাতে আমারও কাজ দেবে, অন্যেরও মঙ্গল হবে। তাতে সন্দেহ নেই বটেই তো! জানো, ভগবান ওদের মার্জনা করুন, কত ওরা রোজগার করে এই করে?

রাতাজ্যায়েভের কথাই ধরো না, এক পাতা লেখা ওর পক্ষে কিছুই নয়। দিনে ও পাঁচ পাতা পর্যন্ত লিখে ফেলতে পারে। কিন্তু তার জন্যে কত পায় ও জানো? তিনশ রুবল! ও বলেছে। আর যদি গল্পটা মজার হয়, লোকে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, তাহলে ও পাবে পাঁচ শ'য়ের মতো। দেব না বললে চল্‌বে না। বলছে, মাঝে মাঝে পায় একেবারে এক হাজার! গাঁইগুঁই চলবে না, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না। কি জানো, ভারেঙ্কা, নেহাৎ এক টুকরো কবিতা—সে রকম কবিতা ওর আছে খাতা ভর্তি—সে কবিতার দাম সাত হাজার রুবল, এক কোপেকও কম নয়! ভেবে দেখো একবার—একেবারে জমিদারির দাম, দালান-কোঠার দাম! ও বলছে, ওরা পাঁচ হাজার দিতে চেয়েছে, কিন্তু ও ডেঁটে আছে। কত না মিনতি করে বুঝিয়ে বলেছি ওকে, ভগবানের দোহাই, চুলোয় যাকগে পাঁচ হাজারই নিয়ে নিন। নগদ একেবারে পাঁচ হাজার। কিন্তু ও একেবারে ডেঁটে আছে। 'সাত হাজারই দিতে হবে!' বুদ্ধিমান লোক, তাই না?

মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বরং ওর 'ইতালীয় আবেগ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তোমাকে শোনাই,

তুমি নিজেই বিচার করে দেখো। ওর বইখানার নাম হল ‘ইতালীয় আবেগ’:

‘... ভ্লাদিমির চমকে উঠল, কেন না শিরায় শিরায় ওর কামনার আবেগ ফুলে ফুলে উঠে একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছিয়েছে...

‘ও চিৎকার করে বললে, “কাউণ্টেস্, তুমি কি জানো আমার এই প্রেম কি ভয়ানক, কি অসীম এই উন্মত্ততা? জানো না! স্বপ্ন আমার মিথ্যা হয়নি! তোমায় আমি ভালোবেসেছি আত্মহারার মতো, দানবের মতো, পাগলের মতো! তোমার স্বামীর দেহের সমস্ত রক্ত ঢেলেও আমার আত্মার মধ্যে যে ভয়ঙ্কর উন্মাদনা উদ্বেল হয়ে উঠছে তাকে প্রশমিত করা যাবে না! আমার দীর্ণ বক্ষের মাঝে যে সর্বগ্রাসী নারকীয় আগুন জ্বলে উঠেছে, কোনো তুচ্ছ বাধায় তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না! ও জিনাইদা! জিনাইদা আমার!...”

‘ভ্লাদিমিরের বুকে এলিয়ে পড়ে প্রায় আত্মহারার মতো কাউণ্টেস অস্ফুট স্বরে বললে, “ভ্লাদিমির!”

‘উল্লসিত স্লোল্স্কি পুনরায় চিৎকার করে বললে, “ও জিনাইদা!”

‘ওর নিঃশ্বাস পড়ছিল তীক্ষ্ণ ভাঙা ভাঙা। হতভাগ্য দুটি দুঃখীর হৃদয় বিদীর্ণ করে কামনার বেদীতে জ্বলছে প্রেমের প্রদীপ।

‘“ভ্লাদিমির!” উন্মাদনায় ফের ফিসফিস করে বললে কাউণ্টেস, বুক তার ফুলে ফুলে উঠছিল, আভা ফুটে বেরুচ্ছিল দুই কপোলে, আর আগুন ছুটছিল চোখ থেকে।

‘নতুন আর ভয়ঙ্কর একটি মিলন পেল পরিণতি!

. . . .

‘আধ ঘণ্টা পরে বৃদ্ধ কাউণ্ট্ এসে ঢুকলেন তাঁর স্ত্রীর প্রকোষ্ঠে। বললেন, “প্রিয়তমে, আমাদের সম্মানিত অতিথির জন্যে সামোভার তৈরি করা উচিত, তাই না?” এই বলে আদর করলেন স্ত্রীর গাল নেড়ে।’

কি রকম লাগল, ভারেঙ্কা? একটু বোধ হয় চটুল, তাই না? তবু ভালো। ভালো হলে তা স্বীকার করতে হবে বৈকি! আচ্ছা, এইবার ‘এর্মাক ও জ্যুলেইকা’ নামে ওর একটা গল্প থেকে কিছুটা।

কল্পনা করে নাও, সাইবেরিয়ার জার কুচুমের মেয়ে জ্যুলেইকার প্রেমে পড়েছে সেই ভীম ভয়ঙ্কর

সাইবেরিয়া-বিজয়ী কসাক এর্মাক। জ্যুলেইকা তার হাতে বন্দী। মানে, একেবারে সেই ভয়ঙ্কর ইভানের যুগের একটা তাজা গল্প। এইবার এর্মাক ও জ্যুলেইকার মধ্যে কথোপকথন।

' "তুমি আমায় ভালোবাস, জ্যুলেইকা? আবার বলো, তুমি আমায় ভালোবাস! ভালোবাস!..."

' "ভালোবাসি, ভালোবাসি এর্মাক!" ফিসফিস করে বললে জ্যুলেইকা।

'তাহলে স্বর্গমর্ত্য তোমাদের ধন্যবাদ! স্বর্গমর্ত্য সাক্ষী, তুমি আমায় সুখী করে দিলে!... শৈশব থেকে আমার পীড়িত আত্মা যা কিছু কামনা করেছে, তার সব, সব দিলে তুমি। এই জন্যেই তুমি আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছ, হে আমার ধ্রুব তারা — এই জন্যেই তুমি আমাকে অতিক্রম করিয়ে এনেছ উরালের প্রস্তর বেষ্টনী! সারা বিশ্বের কাছে আমি এবার আমার জ্যুলেইকাকে তুলে ধরব, মানব, দানব কারো সাধ্য নেই আমায় নিন্দিত করে। হায়, লোকে যদি ওর কোমল হৃদয়ের গোপন যন্ত্রণার মর্ম বুঝতে পারত, যদি দেখত ওর ছোটো ছোটো অশ্রুবিন্দুর মধ্যে কি কবিতা ফুটে উঠতে চাইছে। অনুমতি দাও, ঐ

চোখের জল আমি চুম্বনে মুছে নিই, হে অপার্থিব দেবী, তোমার ঐ স্বর্গীয় অশ্রুবিন্দু আমি পান করি।

'জ্যুলেইকা বললে, "এর্মাক, পৃথিবী যে বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ যে বড়ো কুটিল। তারা যে আমাদের বিতাড়িত করবে তাদের মধ্যে থেকে—তারা যে আমাদের নিন্দিত করবে, হে আমার প্রিয়তম এর্মাক! সাইবেরিয়ার প্রিয় তুষারের মধ্যে পিতার শিবিরের তলে যে হতভাগিনী ললনা বেড়ে উঠেছে সে যে তোমাদের কৃত্রিম আর তুহিন, উদ্ধত আর কেতাদুরস্ত উচ্চ সমাজের মধ্যে শুকিয়ে উঠবে! অন্তরের ধন আমার, ওরা যে আমাকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না।"

' "তাই যদি হয়? তাহলে তাদের মাথার ওপরে শনশনিয়ে গান গেয়ে উঠবে কসাকের তরবারি!" দু'চোখে অগ্নি বর্ষণ করে চিৎকার করে উঠল এর্মাক।'

ভেবে দ্যাখো, ভারেঙ্কা, ও যখন শুনল ছোরার আঘাতে জ্যুলেইকা খুন হয়েছে, তখন কি রকম লেগেছিল ওর। রাত্রির অন্ধকারে অন্ধ বৃদ্ধ কুচুম এর্মাকের শিবিরে চুপি চুপি ঢুকে নিজের কন্যাকে খুন করলে। যে লোকটা তার সিংহাসন আর রাজদণ্ড কেড়ে নিয়েছে,

এই ভাবেই তার মারাত্মক শোধ নিতে হবে, এ কথা ও জানত।

' "পাথরের সঙ্গে আমার তরোয়ালের ঘর্ষনে যে আগুন ছোটে, তা দেখতে চাই আমি।" মন্ত্রপূত পাথরের ওপর তরোয়ালের শান দিতে দিতে ক্রোধাবেগে চিৎকার করে উঠল এর্মাক: "ওর বুকের রক্ত চাই আমি, রক্ত চাই, টুকরো টুকরো করে দিতে চাই শয়তানটাকে !!!" '

তারপর জ্যুলেইকার বিয়োগ ব্যথা সইতে না পেরে এর্মাক ইর্তীশ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখানেই গল্পের শেষ।

এবার একটু রস করে লেখা, একটু লোক হাসাবার মতো :

'ইভান প্রকোফিয়েভিচ্ জেল্‌তোপুজ্ কে জানেন তো? প্রকোফি ইভানভিচের পা ওই কামড়ে দিয়েছিল। ইভান প্রকোফিয়েভিচের চরিত্রটা একটু নিষিদ্ধ রকমের, কিন্তু নানা গুণ আছে ওর। অন্য দিকে প্রকোফি ইভানভিচ্ হল গিয়ে মূলো আর মধুর ভক্ত। পেলাগেয়া আন্তোনভ্‌নার সঙ্গে যখন ওর বন্ধুত্ব ছিল... পেলাগেয়া আন্তোনভ্‌নাকে জানেন না? ওই যে-মেয়েটা সবসময়েই তার পেটিকোটটা উল্টো করে পরে।'

কি রকম হাস্যরস, দেখেছ ভারেঙ্কা? খাঁটি হাস্যরস! ও যখন এটা পড়ে আমাদের শোনাচ্ছিল, তখন হাসিতে আমাদের পেট একেবারে ফাটে ফাটে। এই রকমই লোক বটে ও, ভগবান ওকে ক্ষমা করুন। হয়ত জিনিসটা একটু বেশি চটুল এবং নিতান্ত বানানো, তবু ভারি নির্দোষ, স্বাধীন চিন্তা এবং উদারনীতি-টিতি এর মধ্যে কিছু নেই। এ কথা বলতেই হবে ভারেঙ্কা, যে রাতাজ্যায়েভ খুবই সচ্চরিত্র লোক — অতএব চমৎকার লেখকও বটে — অধিকাংশ লেখক সম্পর্কেই তো এ কথা বলা মুশকিল।

আর কেমন হয় — মানুষের কত বিচিত্র খেয়ালই না জাগে ভারেঙ্কা, কিন্তু কেমন হয়... বলো তো যদি আমিও কিছু লিখতে শুরু করি। কেমন হয় যদি হঠাৎ বেরোয় একটা বই, 'মাকার দেভুশ্‌কিনের কবিতাবলী'! কি বলবে তখন, আমার রাণী? কি রকম লাগবে তোমার? আমার কথা যদি বলো, বই বেরুলে আমি কিন্তু নেভ্‌স্কি প্রস্‌পেক্ট দিয়ে হাঁটার সাহস পাব না। লোকে সবাই যদি আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'ঐ যে যাচ্ছে দেভুশ্‌কিন, কবি এবং সাহিত্যিক!' 'দেভুশ্‌কিন স্বয়ং!' বুটগুলো নিয়েই বা কি করব তখন?

প্রসঙ্গত, বলে রাখি, বুট জোড়া আমার সবসময়েই তাপ্পি দেওয়া, তলাকার সোলটাও মাঝে মাঝে বিছ্ছিরিভাবে খুলে খুলে আসে। কি কাণ্ডই হবে যদি সবাই দেখে ফেলে কবি এবং সাহিত্যিক দেভুশ্‌কিন কিনা চলেছে তাপ্পি মারা ছেঁড়া জুতো পরে! চোখে পড়লে কাউণ্টেস-ডাচেস বলবেন কি? অবিশ্যি মনে হয় না আদৌ তিনি তা লক্ষ্য করবেন, কেন না কাউণ্টেসরা কখনো লোকের বুটের দিকে, বিশেষ করে কেরানির বুটের দিকে চেয়ে দেখেন না (বুটের মতো বুটও আছে বৈকি)। কিন্তু আমার আপন বন্ধুরাই আমার কথা বলে দেবে, রাতাজ্যায়েভ তো সবার আগে। ও বলে, ও নাকি রোজই কাউণ্টেস ব... এর সঙ্গে দেখা করতে যায়। বহুদিনের বন্ধুর মতো সেখানে ওর গতিবিধি—কোনো ভদ্রতার প্রয়োজন হয় না। ও বলে, কাউণ্টেস ভারি অমায়িক মহিলা, ষোলো আনা সাহিত্য-রসিকা। ঐ রাতাজ্যায়েভ লোকটা তোফা লোক বটে!

কিন্তু অনেক বকেছি। লিখেছি শুধু লেখার আনন্দেই, আর তোমাকে খুশি করার জন্যে। বিদায়, ভারেঙ্কা, অনেক আজেবাজে কথা লিখেছি, কিন্তু সে শুধু এই জন্যে যে আমার মেজাজটা আজ খুব ভালো।

রাতাজ্যায়েভের ঘরে আজ আমরা সকলেই নেমন্তন্ন খেয়েছি, ওরা (ঐ রাস্কেলগুলো) মদ্যপানও করেছে... এ কথা না লিখলেই হত। কিন্তু আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভেবো না। যা কিছু হয়েছে সে শুধু কেবল আজেবাজে কথাবার্তা। বইগুলো তোমায় পাঠাব, নিশ্চয় পাঠাব... পল্ দ্য কক্-এর একটা বই এখন বাড়ির মধ্যে খুব ঘুরছে। কিন্তু ও বই তোমার জন্যে নয় ভারেঙ্কা, কিছুতেই তোমাকে দেওয়া চলে না। ওতে যা লেখা আছে তা তোমার পড়া উচিত নয়। শুনেছি, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সমস্ত সম্ভ্রান্ত নীতিবান সমালোচকেরাই বইটি পড়ে চটে গেছেন। এক পাউণ্ড মিষ্টি পাঠালাম—বিশেষ করে তোমার জন্যেই কেনা। খেয়ে দেখো, ভারেঙ্কা, আর একটা করে মুখে তোলার সময় আমার কথা ভেবো। জিনিসটা চুষে খেতে হবে কিন্তু, কখনো কামড়াবে না, কামড়ালে দাঁতের ব্যথা হতে পারে। ফলের শুকনো মোরব্বা পছন্দ করো তুমি? করলে লিখো। তাহলে আসি, ভারেঙ্কা, বিদায়। আমার ছোট্টো আদরিণী, খ্রীষ্ট তোমার সঙ্গে থাকুন!

চিরকাল তোমার অকৃত্রিম বন্ধু,

মাকার দেভুশ্কিন।

২৭শে জুন

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

ফেদোরা বলছে, আমি রাজী হয়ে গেলে এমন কিছু লোক আছে যারা আমাকে খুশি হয়ে সাহায্য করে গভর্নেস'এর ভালো একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। রাজী হব কি না বলো। তোমার কি মত? রাজী হয়ে গেলে তোমার ওপর আর বোঝা হয়ে আমায় থাকতে হবে না। কাজটায় পয়সাও পাওয়া যাবে। অন্য দিকে অপরিচিত একটা সংসারে গিয়ে ঢুকতে হবে ভাবলেও আমার কেমন বিছ্ছিরি লাগে। ওরা এক রকমের জমিদার, আমার অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কি বলব তখন? তাছাড়া, আমি কেমন একটু বুনো-বুনো, লোক দেখলে অস্বস্তি লাগে। যে সব জায়গায় আমি অনেক কাল থেকেছি, তেমন জায়গায় জীবনটা কষ্টের হলেও স্বস্তিতে থাকি। জায়গাটাও অনেক দূরে। কে জানে কি কাজ সেখানে করতে হবে, হয়ত ছেলে মানুষ করতেও হতে পারে। ওদের সঙ্গে চলাও বোধ হয় মুশকিল হবে। দু'বছরের মধ্যেই দুটি গভর্নেস ওদের ওখানে কাজ করে গেছে। তুমি একটু পরামর্শ দাও,

মাকার আলেক্সেয়েভিচ, যাব, কি যাব না? তুমি আমাদের সঙ্গে মোটেই দেখা করতে আসো না কেন? ইদানীং তোমার দেখাই প্রায় নেই। যা দেখা হয় সে শুধু রবিবারে, তাও আবার গির্জায় উপাসনার সময়। তুমিও খানিকটা বুনো-বুনো! ঠিক আমার মতোই! অথচ আমি তো তোমার প্রায় আত্মীয় বললেই হয়। তুমি আমায় মোটেই ভালোবাস না, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, এদিকে একা একা বিষণ্নভাবে দিন কাটে আমার। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে সন্ধ্যের দিকে, আমি একেবারে একা বসে থাকি, একেবারে একা। ফেদোরা হয়ত কোথাও চলে যায়, আর আমি বসে ভাবি আর ভাবি—যত পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে কোনো দুঃখের কথা, কোনো আনন্দের কথা—চোখের সামনে ছবির মতো আবছা-আবছা সব ভেসে যায়, চেনা চেনা মুখগুলোকে সব দেখি (একেবারে যেন সব জীবন্তের মতো), মাকে দেখি অন্য সবার চেয়ে বেশি করে... আর কি যে সব স্বপ্ন আসে ঘুমের মধ্যে। টের পাচ্ছি, আমার স্বাস্থ্যটা গেছে, ভারি দুর্বল লাগে আমার। আজও সকাল বেলা উঠতে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। কিছু দিন যাবৎ খারাপ একটা কাশি ধরেছে! কেমন

মনে হয় শীগগিরই মরে যাব। মরলে কেই বা আমার জন্যে ভাববে, কেই বা কাঁদবে, কফিনের পেছনে পেছনে কেই বা যাবে কবরখানা পর্যন্ত?... হয়ত মরতে হবে অজানা-অচেনা এক সংসারে, অজানা-অচেনা এক জায়গায়। ওহ্ ভগবান, বড়ো দুঃখের এই জীবন!

প্রত্যেকবার আমায় কেন মিষ্টি খাওয়াতে চাও, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্? সত্যিই ভেবে পাই না টাকা আসে কোথা থেকে? প্রিয় বন্ধু, টাকা তোমার একটু জমিয়ে রাখো। ভগবানের দোহাই খরচ করে ফেলো না। আমার এম্ব্রয়ডারি করা একখান কম্বল ফেদোরা বিক্রি করছে। ওরা দাম দিতে চাইছে ব্যাঙ্ক নোটে পঞ্চাশ রুবল। বেশ ভালো দাম, অতটা পাব আশাই করিনি। তিন রুবল দেব ফেদোরাকে, আর নিজের জন্যে একখানা ফ্রক সেলাই করে নেব, সাদামাটা, কিন্তু গরম গোছের একটা ফ্রক। আর তোমার জন্যেও বানাব একটা ওয়েস্ট কোট—নিজেই বানাব, ভালো জাতের একটা কাপড় দিয়ে।

ফেদোরা একটা বই এনেছে 'বেলকিনের গল্প'*

* ১৮৩০ সালে পুশ্‌কিনের লেখা একটি গল্প-সংগ্রহ।

তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। ইচ্ছে হলে পড়ো কিন্তু দয়া করে নোংরা কোরো না কিংবা বেশি দিন ফেলে রেখো না। বইটা আমার নয়; পুশ্‌কিনের রচনা, দু'বছর আগে আমি আর মা গল্পগুলো একসঙ্গে বসে পড়েছিলাম। একা একা এখন পড়তে হলে ভারি মন খারাপ লাগবে। কোনো বই থাকলে পাঠিও, কিন্তু রাতাজ্যায়েভের বই নয়। ওর নিজের বই যদি আদৌ কিছু ছাপা হয়ে থাকে, তাহলে ও হয়ত তাই দিতে চাইবে। ও লেখাগুলো কি করে তোমার ভালো লাগল, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্? একেবারে রাবিশ মাল। এখন আসি। অনেক বকেছি। মন খারাপ থাকলে মাঝে মাঝে আমায় বকুনিতে পায়। তাতে ওষুধের কাজ করে। কথা বলে খানিকটা হালকা করে নিই মনের বোঝা। বিদায়, বন্ধু, আসি।

তোমার

ভ. দ.

২৮শে জুন

আমার আদরের ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না।

ছি, অমন হতাশভাবে মাথা নোয়াতে হয় কখনো? ছি, ছি, আমার রাণী! কোথা থেকে ও সব ভাবনা ঢুকিয়েছ মাথায়? মোটেই তুমি অসুস্থ নও, মোটে নও! তুমি তো এখন ফুটে উঠছ, ফুলের মতো ফুটে উঠছ! একটু ফ্যাকাশে হয়ে আছ হয়ত, তবু ফুটে উঠছ সন্দেহ নেই। কেন অত ভাবনা আর দিবাস্বপ্নগুলো? ছি, আমার ছোট্ট আদরিণী, তুড়ি মেরে ও সব উড়িয়ে দাও। কেমন করে আমার এত ভালো ঘুম হয় দেখো দেখি, কিছুতেই আমার অসুবিধা হয় না। আমার দিকে দেখো দিকি! কাঠের মতো নিঃসাড়ে ঘুমোই আমি, দিব্যি স্বাস্থ্য আমার, জোয়ানের মতো তাজা, সত্যি! ছি, ছি ভারেঙ্কা! গা ঝাড়া দিয়ে ওঠো। জানি তোমার ছোট্টো মাথাখানায় কি ঘুরছে। এতটুকু কিছু একটা হলেই শুরু হবে তোমার দিবাস্বপ্ন আর খুঁতখুঁতি। দোহাই তোমার, অমন আর কখনো কোরো না। আর গভর্নেসের কাজ? সে কখনো হতে পারে না। না, না, না! দ্যাখো দেখি! কি করে ভাবতে পারলে! তোমার

হয়েছে কি? তার ওপর জায়গাটাও অত দূরে। না, ভারেঙ্কা, আমার মত নেই। যথাসাধ্য আমি এর বিরুদ্ধে। আমি বরং আমার পুরনো ফ্রক-কোটটাও বিক্রি করে শার্ট গায়ে ঘুরব তবু অভাবে তোমার কষ্ট হবে—তা হতে দেব না। না ভারেঙ্কা, ও কাজ তোমার জন্যে নয়। নেহাৎ বোকামি, একেবারে পাগলামি হবে তাহলে। নিশ্চয় জানি, এ নির্ঘাৎ ফেদোরার কীর্তি। ওই নির্বোধ মেয়েটাই তোমার মনে এ সব ঢুকিয়েছে। ওর কথা শুনো না, লক্ষ্মীটি, ওর অনেক কথাই তুমি জানো না... মেয়েটা একটা নির্বোধ, গুজব রটাবার ঠানদিদি। ওর জ্বালাতেই ওর স্বামী বেচারা মারা গেছে। ওর কথা শুনে শুনে তোমার রাগ ধরেছিল বোধ হয়? না, না, ভারেঙ্কা, দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্যেই ও কাজ চলতে পারে না! তাহলে আমি করব কি, কি থাকবে আমার? না, ভারেঙ্কা, না গো, না! ও সব চিন্তা মন থেকে ধুয়ে ফেলো। যাই বলো, এখানে তোমার কিসের অভাব? তোমাকে পেয়ে কত আনন্দ আমাদের—ফেদোরার আর আমার! তুমিও আমাদের ভালোবাস। তাহলে, যেমন আছো, তেমনি গুটিস্টুটি হয়ে থেকে যাও না কেন! পড়তে পারো, সেলাই করতে পারো—কিংবা সেলাই করারও দরকার নেই, শুধুই পড়ো—কেবল চলে যেয়ো না।

ও মোটেই চলবে না, যাওয়াটি হবে না! তোমার যা বই দরকার এনে দেব, ফের একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া শুরু করব আমরা, কিন্তু মাথাটি ঠিক কোরো, এ সব আজেবাজে কথা আর কখনো ভাববে না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, খুব শীগগিরই যাচ্ছি।

খোলাখুলি বলছি বলে রাগ কোরো না — কিন্তু না বলেও পারছি না: লজ্জার কথা ভারেঙ্কা, ভারি লজ্জার কথা — বিদ্বান লোক আমি নই সত্যিই। স্কুলে যেটুকু পড়াশুনা করেছি, তা হল গে ওই যে কথায় বলে না, ধান চাল দিয়ে লেখাপড়া শেখা। কিন্তু আমার কথা বলতে চাই না, বলতে চাই রাতাজ্যায়েভ সম্পর্কে। রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি, কিন্তু ওর পক্ষ হয়ে আমাকে বলতেই হবে। ও আমার বন্ধু, না বলে আমি পারি না। ও ভালোই লেখে, সত্যি ভালো লেখে, মোটেই খারাপ লেখক ও নয়। এ ব্যাপারে আমি তোমার কথা মানতে পারছি না, কিছুতেই পারছি না। কি রকম ফলাও ভাবে ও লেখে, কি আবেগ দিয়ে, কত রকম তার শব্দালঙ্কার, কত রকমের ভাব। মোটেই খারাপ নয়! হয়ত, তুমি ঠিক মেজাজ নিয়ে পড়োনি, ভারেঙ্কা? হয়ত মনটা বিগড়ে ছিল তোমার, ফেদোরার সঙ্গে

রাগারাগি হয়েছিল কি, নাকি অপ্রীতিকর অন্য কিছু একটা ঘটেছিল? ফের পড়ে দেখো ভারেঙ্কা, ঠিক মেজাজ নিয়ে, আর একটু মন দিয়ে। মনটা তোমার যখন বেশ হাসিখুশি তৃপ্তিতে ভরা—যেমন ধরো যখন তুমি লজেন্স মুখে দিয়েছ, তখন পড়ো। এ কথা অবশ্যই মানি যে রাতাজ্যায়েভের চেয়ে ভালো লেখক আছে, অনেক ভালো। তারা ভালো লেখক, কিন্তু রাতাজ্যায়েভও ভালো লেখক। তারা ভালো লেখে, কিন্তু রাতাজ্যায়েভও খারাপ লেখে না। সবকিছু সে নিজের মন থেকে লেখে, নিজেই লেখে—সেটা ভালো কথা বই কি! বিদায় ভারেঙ্কা, বেশি লিখতে পারছি না। খুব ব্যস্ত আজকে। কাজ আছে। কিন্তু মনে রেখো, আমার ছোট্টো পাখি, দুর্ভাবনা ভেবে আর মন খারাপ করবে না, ঈশ্বর তোমার সহায় থাকুন এবং আমি রইলাম।

চিরকাল তোমার সত্যকার বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

পুঃ বইখানির জন্যে অনেক ধন্যবাদ, ডার্লিং। আমি পুশ্‌কিনও পড়ব। আজকে সন্ধ্যের দিকে তোমাদের ওখানে নিশ্চয় যাব।

১লা জুলাই

প্রিয় বন্ধু, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

এখানে তোমাদের মধ্যে আমার জীবন যাত্রার কোনো মানে নেই, এ কথা সত্যিই আমার মনে হচ্ছে। ভেবে চিন্তে দেখেছি এমন একটা সুবিধাজনক প্রস্তাব ছেড়ে দেওয়া অন্যায় হবে। অন্তত নিজের রোজগারে নিজেরটা চালাতে পারব তো। তাছাড়া অজানা একটা পরিবারের কাছ থেকে সহৃদয়তা পাবার জন্যে যথাসাধ্য করব আমি। দরকার হলে নিজের স্বভাবও বদলে নিতে হবে। অজানা-অচেনা লোকের মাঝে বাস করা, তাদের মনোরঞ্জন করে চলা, মনের কথা মনে চেপে থাকা —এ সব অবশ্যি কঠিন হবে। কিন্তু ভগবান হয়ত সহায় হবেন। সারা জীবন ধরে ভীরু বুনো হয়ে কাটিয়ে দেওয়া তো চলে না! এ রকম ব্যাপার তো আমার জীবনে আগেও ঘটেছে। বোর্ডিং স্কুলের দিনগুলো তো ভুলিনি। মনে পড়ে সেই রবিবারগুলোর কথা, দৌড়ে দৌড়ে লাফাতে লাফাতে যখন বাড়ি ফিরতাম। বাড়িতে মা বকলেও আমার বুকের ভেতরটা ভারি হালকা আর স্বচ্ছন্দ লাগত। আর যেই সন্ধ্যে হয়ে আসত, অমনি শুরু হত দুঃখের

যন্ত্রণা : ন'টার মধ্যেই স্কুলে পেঁছিতে হবে—সেই স্কুল, যেখানে সবকিছুই কেমন পর পর আর বিদঘুটে আর কড়া, আর সোমবারে যেখানে শিক্ষিকাদের মেজাজ থাকত সবসময়েই ভার ভার। বুক ভেঙে কাঁদতে ইচ্ছে করত। কোনো একটা কোণ বেছে নিয়ে কাঁদতাম লুকিয়ে লুকিয়ে—নইলে ওরা বলত, আমি আল্‌সে। অথচ কান্নার সঙ্গে আমার পড়ার কোনো সংস্রব ছিল না। কিন্তু কি হল তাতে? সময়ে ইস্কুলটাও সয়ে গেল। সেখান থেকে বন্ধুদের ছেড়ে চলে আসার সময়েও আবার কাঁদলাম।

তাছাড়া তোমার আর ফেদোরার ওপর বোঝা হয়ে থাকব এ ঠিক নয়। এ চিন্তা আমাকে বড়ো কষ্ট দিচ্ছে। খোলাখুলি সব বলছি, কেন না তোমার সঙ্গে তো কিছু রাখা ঢাকার ব্যাপার নেই। এ তো আমার না-দেখা নয়। সেই সাত সকালে উঠে ফেদোরা কি করে তার ধোয়া কাচার কাজ চালায় সারা দিন ধরে? জানোই তো, বুড়ো মানুষের একটু বিশ্রাম দরকার। এও তো আমার না-দেখা নয় যে, তুমি তোমার সর্বস্ব, শেষ কোপেকটি পর্যন্ত আমার পেছনে ঢালছ। এ সবই যে

বন্ধু, তোমার ঐ অল্প মাইনের ওপরই চাপছে। এমন কি এও লিখলে যে, অভাবের তাড়না থেকে আমায় বাঁচাবার জন্যে তুমি গায়ের কোটখানাও বিক্রি করতে রাজী। তোমার কথা বিশ্বাস করি, তোমার সহৃদয় অন্তঃকরণের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু এ কথা তুমি বলছ এখন, যখন হঠাৎ তোমার একটা প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে, ওই বোনাসটা পেয়েছ! কিন্তু পরে? জানোই তো, অসুখ আমার লেগেই আছে। তুমি যেমন করে কাজ করতে পার, তেমন করে কাজ আমি করতে চাইলেও পারি না। তাছাড়া, সবসময় কাজ পাওয়া যাবে এমনও নয়। তাহলে করার আর কি থাকবে আমার? শুধু তোমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া তো। তোমাদের দুজনের কাছে কতটুকু কি কাজে লাগব আমি? আমায় তোমার কি দরকার? কি উপকার তোমার আমি করেছি? সর্বান্তঃকরণে আমি তোমায় ভালোবাসি — অতি, অতি প্রিয় তুমি আমার কাছে, কিন্তু এই যে আমার নিয়তি! ভালোবাসি, ভালোবাসতে পারি, কিন্তু সে ভালোবাসা দিয়ে তো কোন ভালো কাজ করতে পারি না। তোমার দয়ার যে প্রতিদান দিতে

পারি না। আর আমাকে আটকে রেখো না। ভালো করে ভেবে তোমার চূড়ান্ত মত জানিয়ো। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

তোমার স্নেহের

ভ. দ.

১লা জুলাই

কি সব আজেবাজে কথা, কি পাগলামি শুরু করেছ, ভারেঙ্কা! একলা থাকলেই তোমার ছোট্ট মাথায় যত রাজ্যের পাগলামি এসে জুটবে! এটা ভালো লাগে না, সেটা ভালো লাগে না। ফের আবার বলছি: ও সবই হল তোমার বাই আর পাগলামি! আর কি চাই তোমার বলো তো শুনি, কি তোমার অভাব? আমাদের সকলের মধ্যেই বেশ প্রীতি রয়েছে, সুখ আর তৃপ্তি রয়েছে — আর কি চাও? অজানা-অচেনা লোকের মধ্যে গিয়ে কি পাবে তুমি? তারা যে কি রকম মানুষ তাও তোমার জানা নেই ... আমাকে তো জিগ্যেস করতে পারতে, কি রকম লোক তারা। আমি চিনি, খুব ভালো করেই আমি চিনি ওদের। ওদের নুন আমি খেয়ে দেখেছি। খারাপ লোক ওরা,

খুব খারাপ ভারেঙ্কা, তোমার যত কিছু স্নেহ ঢেলেও ওদের বিদ্বেষের পার পাবে না। কড়া কড়া বকুনি আর বাঁকা বাঁকা চাউনি দিয়ে ওরা তোমায় একেবারে শেষ করে ফেলবে। আর এখানে আমাদের সঙ্গে তুমি আছ পাখির বাসার ছোট্ট পাখিটির মতো আরামে। তুমি যদি উড়ে পালাও, তাহলে আমাদের চুরি-যাওয়া হৃদয় নিয়ে কি করব আমরা, বলো? এই বুড়ো মানুষটাই বা কি করবে? তুমি বলছ তুমি অপ্রয়োজনীয়। অপ্রয়োজনীয়? কি বলছ! মোটেই নয়! প্রথমত, তোমার প্রভাবটা খুব কাজের... যেমন এই মুহূর্তেই আমি তোমার কথা ভেবে ভারি আনন্দ পাচ্ছি... মাঝে মাঝে আমি আমার সমস্ত ভাবাবেগ পত্রাকারে লিখে পাঠাই এবং তোমার কাছ থেকে বিশদ উত্তর পাই... তোমার পরার জন্যে কিনে দিই সুন্দর সুন্দর জিনিস। টুপিরও ফরমাস্ দিয়েছি... কিংবা তোমার কোনো একটা দরকার পড়লে, আমি করে দিতে পারি। কি করে বলো যে তোমার দরকার নেই? তাছাড়া একেবারে একা একা আমার মতো এই বুড়ো মানুষটা করবেটা কি? সে কথাটা নিশ্চয় তুমি ভেবে দেখোনি, ভারেঙ্কা, কিন্তু ভাবা উচিত ছিল। ভাবো তো দেখি:

আমি না থাকলে বুড়ো মানুষটা কি করবে? তুমি কাছাকাছি আছ, এইটেই আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। তুমি না থাকলে আমার শুধু একটি কাজই করা বাকি থাকবে: নেভা নদীতে গিয়ে সবকিছু চুকিয়ে দেওয়া। সত্যিই বলছি। তাছাড়া আর কি করার আছে? সত্যি, ভারেঙ্কা, আদরের ভারেঙ্কা আমার, মনে হচ্ছে তুমি চাও যে একা একা একটা গাড়িতে চাপিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হোক ভোল্কভো কবরখানায়, সেখানে যখন বালি দিয়ে ওরা আমার কবর ভরাট করে দেবে তখন তা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু এক শ্মশানবান্ধব-বুড়ী ভিখিরি, তারপর চলে যাবে ওরাও বিস্মৃতির মধ্যে আমাকে ফেলে রেখে দিয়ে। এই যদি চাও তো সেটা অপরাধ হবে ভারেঙ্কা, ভয়ানক অপরাধ হবে। তোমার বইখানা ফেরত দিচ্ছি, আর আমার মত যদি চাও তো বলি, সারা জীবনে এর চেয়ে ভালো বই আমি পড়িনি। নিজের মনে মনে ভাবছি, ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন, এমন গেঁয়ো ভূত হয়ে আমি এত দিন ছিলাম কি করে, নিজেকে নিয়ে এতদিন করলামটা কি? কোন জঙ্গলে দিন কাটালাম? সত্যি বলছি, একটা কিছুও আমার জানা নেই, কিছুই না! খোলাখুলি বলব, আমি একেবারে অশিক্ষিত, ভারেঙ্কা।

খুব কমই আমার পড়াশুনা, ভীষণ কম, প্রায় কিছুই না। 'মানুষের চিত্র'—বইটা ভারি জ্ঞানগর্ভ, তাছাড়া 'যে বালকটি ছোট্ট ঘণ্টায় সুন্দর সুন্দর সুর তুলিতে শিখিয়াছিল' আর 'ইভিক-এর সারস'—এই আমার বিদ্যা। এইটুকুই শুধু পড়া। আর এখন তোমার ঐ বইটাতে পড়লাম 'পোস্টমাস্টার'* । কি রকম দ্যাখো, ভারেঙ্কা, দিনের পর দিন কেটে গেলেও অনেক সময় মানুষ জানতেই পারে না, যে হাতের কাছেই এমন একটা বই আছে, যাতে সারা জীবনের পুরো কাহিনীটাই নখ দর্পণে ফুটিয়ে তুলেছে। আগে যা বোঝা যায়নি, পড়তে পড়তে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর কত কত কথা মনে পড়ে যায়, কত কি বোঝা যায়, কত কি কল্পনা জেগে ওঠে। এ ছাড়া বইটা সম্পর্কে আর যা ভালো লেগেছে তা এই: অন্য অনেক বই মাঝে মাঝে এতই উঁচু দরের যে পড়ে পড়ে মাথা খুঁড়লেও তার কোনো মানে খুঁজে পাই না। স্বভাবটা আমার একটু মোটা রকমের, তাই উঁচু কেতার বুদ্ধিমান ও সব বই আমার পোষায় না কিন্তু এই বইখানা পড়ে মনে হল যেন আমিই লিখেছি,

---

* 'ইভান বেলকিনের গল্প' পুস্তকের একটি গল্প।

যেন বলা যেতে পারে, ভালো হোক মন্দ হোক আমার বুকখানাই বুঝি ওখানে মেলে ধরা হয়েছে, মেলে ধরা হয়েছে তার সমস্ত খুঁটিনাটি। এমনি বই-ই ওটা বটে। সত্যি, ভারি সহজ; আমিও যেন লিখতে পারতাম। কেন পারতাম না বলো? বইতে যা লেখা আছে, আমার অনুভূতিগুলোও তো ঠিক তেমনি। বেচারা সাম্‌সন ভীরিনের* মতো আমারও কি সেই একই অভিজ্ঞতা হয় নি? ভীরিনের মতো কত বেচারাই না আমাদের মধ্যে আছে! আর কি সুন্দর করে লেখা! যখন পড়ছিলাম যে বেচারী মদ খেতে ধরল, মদ খেয়ে অচৈতন্য হয়ে সারা দিন সেই ভেড়ার ছালের ওপর পড়ে পড়ে ঘুমুল, কিংবা পলাতকা হতভাগিনী কন্যার কথা ভেবে ও যখন তার কোটের নোংরা আস্তিন দিয়ে চোখের জল মুছছিল, তখন আমার প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল। এই হল জীবন। পড়ে দেখো আবার, একেবারে জীবন্ত কাহিনী। এ যে আমার নিজেরই দেখা। আমার চারপাশেই তো এই। আমাদের তেরেসার কথা ধরো, কিংবা ঐ বেচারা কেরানিটার কথা। নাম ওর

---

*'পোস্টমাস্টার' গল্পের একটি চরিত্র।

গর্শ্কোভ হলেও আসলে ও তো দ্বিতীয় এক সাম্সন ভীরিন। আমাদের সকলের অবস্থাই তো ওই, যে কারো ভাগ্যেই তো ঘটনাটা ঘটতে পারত। এমন কি নেভ্স্কি অথবা বাঁধের এলাকায় থাকে এমন একজন কাউণ্টের বেলাতেও হতে পারত, যদিও ওদের উঁচু চালচলনের ফলে জিনিসটা দেখাত অন্য রকম। তবু ব্যাপার তো সেই একই। এমন কি আমার বেলাতেও হতে পারে। দ্যাখো তো: আমাদের ছেড়ে যাবার কথা কি করে ভাবতে পারলে তুমি? ভীরিনের নিয়তি আমাকেও হয়ত আচ্ছন্ন করে ফেলবে, দুজনেরই সর্বনাশ হবে। তাই, ঈশ্বরের দোহাই, লক্ষ্মীটি, ওই সব বেয়াড়া চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও, আমায় আর মিছে যন্ত্রণা দিয়ো না। ছোট্ট পাখির কচি ছানা তুমি, কে তোমায় খাওয়াবে, একা একা কুলোকের হাত থেকে সর্বনাশের হাত থেকে কি করে নিজেকে বাঁচাবে? শোনো শোনো, ভারেঙ্কা, বাজে কথা রাখো! কুপরামর্শে কান দিয়ো না। তোমার বইখানা তুমি আর একবার পড়ো আরো মন দিয়ে। তাতে তোমার ভালো হবে।

'পোস্টমাস্টার' গল্পটার কথা রাতাজ্যায়েভকে বলেছিলাম। ও বলছে জিনিসটা সেকেলে, ভালো

ভালো বইতে আজকাল নানা রকম রঙচঙ আর বর্ণনা থাকে। ওর কথা খুব ভালো বুঝলাম না। ও অবিশ্যি বললে যে পুশ্‌কিন একজন ভালো লেখক, পবিত্র রাশিয়ার মুখ উজ্জ্বল করেছেন ইত্যাদি অনেক কথা। সত্যি ভারেঙ্কা, অনেক ভালো কথা বলেছে ও, ভালো ভালো কথা। ফের মন দিয়ে বইটা তোমার পড়া উচিত। আমার পরামর্শ শোনো, বুড়ো মানুষের কথার বাধ্য হয়ে আমায় সুখী কোরো। ঈশ্বর তোমার ভালো করবেন। ঈশ্বর নিশ্চয় তোমার ভালো করবেন।

তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

৬ই জুলাই

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্‌!

আজ পনেরোটা চাঁদি রুবল নিয়ে এসেছিল ফেদোরা। তা থেকে তিন রুবল ওকে দেওয়াতে বেচারী ভারি খুশি হয়ে গেছে! চিঠিটা লিখছি কিন্তু খুব তাড়াহুড়ো করে। তোমার জন্যে ওয়েস্ট কোটের প্যাটার্ন কাটছি। কাপড়টা চমৎকার। হলদে রঙের ফুল ফুল দেওয়া।

আর একটা বই তোমায় পাঠাচ্ছি—একটা গল্প-সংগ্রহ। কয়েকটা পড়েছি। 'আপিসের কোট' নামে গল্পটা পড়ো। থিয়েটারে যাবার জন্যে জিদ করছ। সে তো ভারি খরচ, তাই না? যদি আদৌ যাই, তাহলে গ্যালারির টিকিট কিনো কিন্তু। মনেই পড়ে না কবে থিয়েটারে গেছি। কিন্তু ওই যে বলছি, পয়সায় কুলবে তো? ফেদোরা মাথা নেড়ে বলছে, তুমি সাধ্যের বাইরে চলেছ। আমি নিজেই তা টের পাচ্ছি—শুধু আমার জন্যেই কি ভীষণ তুমি খরচ করো! ভয় হয়, এমনি চালালে শেষ পর্যন্ত একটা সর্বনাশের মধ্যে গিয়ে পড়বে। ফেদোরা বলছিল, ভাড়া নিয়ে বাড়িউলীর সঙ্গে তোমার কথা কাটাকাটি সম্পর্কে কি গুজব শুনেছে। তোমার জন্যে বড় ভয় হয়। মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, বিদায়, বড়ো তাড়া। ছোটোখাটো কয়েকটা জিনিস সেরে ফেলতে হবে। টুপির ফিতেটা বদলাতে হবে।

ভ. দ.

পুঃ থিয়েটারে যদি যাই, তাহলে কালো হালকা শাল আর নতুন টুপিটা পরব। সুন্দর হবে, না?

আদরের ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না।

... গত কাল আমাদের আলোচনার জের টেনে বলছি : এক সময় আমিও ছিলাম অবিবেচক এক যুবক, এক অভিনেত্রীকে দেখে প্রেমে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও মজার কথা হল, ওকে থিয়েটারে একবার মাত্র ছাড়া আর প্রায় দেখিইনি। তবু একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম প্রেমে। আমাদের বাড়িতে তখন প্রতিবেশী ছিল জন পাঁচেক হুল্লোড়ে কিছু ছোকরা। এদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল প্রায় না চাইলেও। ওদের কীর্তিকলাপ থেকে আমি সতর্কের মতো দূরে থাকতাম। অবিশ্যি ভদ্রতা রক্ষার জন্যে প্রশ্রয়ও দিতাম সাধারণত। ওই অভিনেত্রীটি সম্পর্কে ওরা কত কথাই না আমায় বলেছে। অভিনয় থাকলেই গোটা দলটা গিয়ে বসত গ্যালারিতে—এদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে ওদের পকেটে কিন্তু একটা পয়সাও থাকত না। গ্যালারিতে বসে ওরা হাততালি দিয়ে দিয়ে ওকে বারবার যবনিকার সামনে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনত আর বাহবা দিত পাগলার মতো। তারপর সারা রাত

ঘুমত না—সারা রাত ধরে চলত শুধু ওই গ্লাশার কথা। সকলেই ওরা গ্লাশার প্রেমে পড়েছিল, প্রতিটি লোক। প্রতিটি বুকেই ছিল সেই কোকিল-কণ্ঠীর গান। শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে পর্যন্ত জপালে, বয়স তখন খুব অল্প আমার, কি হচ্ছে বুঝতে না বুঝতে দেখলাম একদিন আমিও গিয়ে ওদের সঙ্গে বসেছি গ্যালারিতে। যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে মঞ্চের শুধু অল্পই একটু চোখে দেখা যাচ্ছিল—কিন্তু কানে যেটুকু শোনার তা কিছুই বাদ দিইনি। সত্যিই, অভিনেত্রীর গলাখানা ছিল ভারি মিষ্টি—মধুমাখা ঝঙ্কার তোলা নাইটিঙ্গেলের ডাকের মতো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললাম আমরা, তালি দিয়ে দিয়ে হাতের ছাল উঠে গেল, এবং এমন ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে পরিশেষে আমাদের একজনকে বার করে দেওয়া হল। বাড়ি ফিরলাম আচ্ছন্নের মতো—পকেটে শুধু একটি রুবল, মাইনে পেতে তখনো দশ দিন বাকি। কি করলাম বলো তো? পরদিনই আপিসে যাবার আগে ফরাসী নাপিতের দোকানে টাকাটি খরচ করে কিনলাম কিছু আতর আর সুগন্ধি সাবান। কেন যে কিনলাম কে জানে। সেদিন অভুক্তই গেল—সারা সময়টা কাটালাম তার জানলার

কাছে ঘুরঘুর করে। নেভ্স্কি প্রস্পেক্টের এক বাড়িতে চার তলায় ও থাকত। কাজের পর বাড়িতে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই রোজ চলে আসতাম ওর জানলার নিচে পায়চারি করার জন্যে। এমনি চলল দেড় মাস ধরে। মাঝে মাঝে মোড় থেকে গাড়ি ভাড়া করে সগৌরবে টগবগিয়ে ছুটাতাম তার জানলার পাশ দিয়ে। দেনা করতে হয়েছিল বৈকি, কিন্তু অবশেষে আমার হৃদয়াবেগ শান্ত হয়ে এল। আর ভালো লাগল না। অভিনেত্রীরা ভালো মানুষদের এমনি দশা করে ছাড়ে। কিন্তু তখন অবিশ্যি আমার বয়স অল্প ছিল।...

ম. দ.

৮ই জুলাই

ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না সুচরিতাসু!

বর্তমান মাসের ছয় তারিখে যে বইটি পেয়েছিলাম, তা ফেরত দিচ্ছি এবং অত্রপত্রে এই সুযোগে একটু বক্তব্যও পেশ করতে চাই। এ রকম বই পাঠানো কিন্তু তোমার অন্যায়। এ দুনিয়ায় যার যা যথাযোগ্য স্থান সে তো বিধাতার নির্বন্ধ। কারো ভাগ্যে আছে জেনারেলের

ইপলেট্, কারো কপালে প্রিভি কাউন্সিলরের পদ, কেউ বা হুকুম দেবে, এবং অন্যেরা বিনা বাক্যে সভয়ে তা মান্য করবে। যার যা ক্ষমতা সেই অনুসারেই তো ব্যবস্থা। কেউ এক রকমের কাজের যোগ্য, কেউ অন্য রকমের — এ তো স্বয়ং ঈশ্বরেরই বিধান। আজ তিরিশ বছর হল আমি আপিসে কাজ করে আসছি। সে কাজ আমার ত্রুটিহীন, আচরণ বিনীত, অবাধ্যতার কোনো ঘটনা আমার নেই। নাগরিক হিসাবে, বিবেক সহকারে এ কথা বলব যে আমার দোষ কিছু আছে, কিন্তু গুণও আছে। উপরিওয়ালারা তথা হুজুর নিজে আমার ওপর সন্তুষ্ট। আমার প্রতি বিশেষ কোনো অনুগ্রহ প্রকাশ না করলেও আমি জানি তিনি সন্তুষ্ট। এতটা বয়স পর্যন্ত জ্ঞানত কোনো গুরুতর পাপ আমি করিনি। আর ছোটোখাটো অন্যায়ের কথা ধরলে, সে কেই বা না করেছে? ছোটোখাটো ব্যাপারে অন্যায় সকলেই করেছে, এমন কি তুমিও করেছ ভারেঙ্কা। কিন্তু দুষ্কর্ম কি দুর্বিনীত আচরণ, অথবা নিয়ম না মানা, কি সামাজিক শান্তিভঙ্গ করা — এ সব দোষ কখনো করিনি। না করিনি। কখনো করিনি। এক সময় ক্রুশ পুরস্কারও আমায় দিয়েছে। কিন্তু এ সব কথা না বললেও চলত। এ সব কথা তো তোমার

বিবেকে থাকা উচিত, এবং ঐ ভদ্রলোক, ঐ লেখকটিরও জানা থাকা উচিত। কেউ যদি সমস্ত কিছু বর্ণনা করতে চায়, তাহলে সমস্ত কিছুই তার জানা থাকা উচিত। তোমার কাছ থেকে আমি এটা আশা করিনি—আর কেউ নয়, শেষ পর্যন্ত তুমি এই করলে ভারেঙ্কা!

তার মানে কি তুমি বলতে চাও, কেউ তার ছোট্ট কোণটিতে গিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করতে পাবে না? ধরো যদি সে, যাকে বলে আপন মনে থাকতে চায়, ঈশ্বরে মতি রেখে, কারো কোনো অনিষ্ট না করে, এবং ন্যায্যতই এই আশা করে যে অন্যেরাও তাকে একলা থাকতে দেবে, অন্যেরাও নিজের মনে থাকুক, ওর ব্যাপারে নাক গলাবে না? অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে উঁকি দেবার কি অধিকার ওদের আছে? আমার ভেস্ট্‌টা সুন্দর কি না, কটা শার্ট আমার আছে, বুট এক জোড়া আমার আছে কি না, থাকলে তার সোল ঠিক মতো কি না—এ নিয়ে অন্যের মাথা ঘামানো কেন? আমি কি খাই, কি পান করি অথবা কি নকল করি—এ সব জানতেই বা হবে কেন?' পেভমেণ্টটা খারাপ থাকলে আমি যদি বুট জোড়া বাঁচাবার জন্যে পা টিপে টিপেই হাঁটি তাতে কার কি? লেখকের এ কথা বলার কি

দরকার যে তার পড়শীটির টানাটানি চলছে, চা খাওয়া বাদ দিয়েছে। যেন সকলের চা খেতেই হবে! আমার পাশের লোকটা যে গ্রাস মুখে তুলছে তা নজর করে করে আমি কি দেখি? দেখি নাকি? কেউ বলতে পারে কখনো দেখেছি? তাহলে অন্যেই বা কেন দেখবে? শোনো ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না, আমি বলতে চাই এই: একটা লোক তার কাজ করে চলেছে নিবিষ্ট মনে—কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত তাকে শ্রদ্ধা করে (যাই বলো না কেন, কথাটা সত্যিই) —অথচ হঠাৎ কোথা থেকে কে এক লেখক এসে বিনা দোষে বিনা কারণে তাকে বোকা বানিয়ে ছাড়লে! অবিশ্যি ঠিক যে মাঝে মাঝে লোকটা তার এটা ওটা নিজেই সেলাই করে নিতে পারে; আনন্দ হলে সে সারা রাত জেগেও কাটাতে পারে, সত্যিই তো। যেমন আমারই তো তাই হয়েছিল, যখন এক জোড়া নতুন বুট আমি পরেছিলাম। নিজের পা দুখানা অমন ভালো গোছের চামড়ায় ঢাকা পড়েছে দেখলে আনন্দ হবে বৈকি। মানছি, লেখক এ সব জিনিস সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তবুও, আমাদের বড়ো কর্তা ফিওদর ফিওদরভিচ্ যে এ রকম বই সমর্থন করলেন দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছি আমি। এ বই দেখে

তাঁর রাগ হওয়া উচিত ছিল, নিজের স্বভাব-চরিত্র সমর্থন করা উচিত ছিল তাঁর। অবশ্য এ কথা সত্যি যে উনি এখনো একজন তরুণ বড়ো সায়েব, বইয়ের বড়ো কর্তাটির মতো উনিও মাঝে মাঝে আমাদের ওপর তম্বি করতে ভালোবাসেন। কিন্তু করবেন নাই বা কেন? কেনই বা তিনি মাঝে মাঝে আমাদের এক চোট ধোলাই দেবেন না? চুনোপুঁটিদের মাঝে মাঝে ধোলাই দেওয়া উচিত। অবিশ্যি সত্যি, এটা তিনি মাঝে মাঝে করেন নেহাৎ কর্তাত্বি ফলাবার জন্যে। কিন্তু ফলাবেন নাই বা কেন? ওঁর কাজই তো হল আমাদের ঠিক মতো চালানো, আমাদের মধ্যে ধর্মভয় ঢোকানো, একটু ভয় আর কি, কেন না ভারেঙ্কা, নিজেদের মধ্যে বলে বলছি, ধর্মভয় না থাকলে আমরা চুনোপুঁটিরা হয়ে যাই একেবারে অকর্মণ্য, সবারই চিন্তা শুধু মাইনেটুকু পাওয়া: কাজের দিকে নজর থাকে না, মোট নজরটা থাকে শুধু কোনো রকমে টিকে থাকা। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে তো নানা কিসিমের পদ, এক এক রকম পদের জন্যে এক এক রকম ধোলাই দেবার ব্যবস্থা থাকা তো স্বাভাবিক, সুতরাং পদ অনুসারে তম্বির সুরও পাল্টাবে। দুনিয়ার রীতিই যে এই, ডার্লিং। আমাদের

মধ্যে একজন আর একজনের ওপরে, এবং কারো কারো কাজ অন্যদের ধোলাই দেওয়া। তা না হলে দুনিয়াটাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত, চুলোয় যেত শৃংখলা। ফিওদর ফিওদরভিচ্ যে এমন স্পর্ধা সইলেন কি করে ভেবে সত্যিই তাজ্জব বনে গেছি!

ও রকম জিনিস লিখে লাভ কি? কি ফল দেবে তাতে? পাঠকেরা কি এসে আমায় একখান নতুন আপিসের কোট উপহার দিয়ে যাবে? নাকি দেবে নতুন এক জোড়া বুট? কিছুটি দেবে না, ভারেঙ্কা। স্রেফ পড়বে এবং একবার পড়লে কেবল এই ধরণের বই-ই পড়তে চাইবে। নিজের দোষ ত্রুটি লোকে অতি সতর্কের মতো ঢেকে রাখতে চায়, অতি সাবধানে নিজের মতো থাকতে চায়, তার কারণ তো লোক-নিন্দা : অথচ এদিকে, তিলকে তাল করে তুলে দেখতে না দেখতে তোমার নাগরিক জীবন, পারিবারিক জীবন সবখানি একেবারে খুলে মেলে নগ্ন করে ধরা হল বইয়ের মধ্যে, তা দেখে লোকে হাসবে, সাতসতেরো কথা তুলবে। তারপর রাস্তায় কি করে মুখ দেখাবে তুমি? সবকিছু এমন হুবহু করে বর্ণনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের হাঁটার ধরণ দেখেই লোকে আমাদের চিনে ফেলবে। তাও না

হয় চলত, যদি বইয়ের শেষের দিকে লেখকের চৈতন্যোদয় ঘটত, ওর ওপর কাগজের টুকরোগুলো ছুঁড়ে মারার বর্ণনা দেবার পর যদি কোনো রকমে জিনিসটা একটু নরম করে দিয়ে বলত যে যাই হোক না কেন, ধর্মভীরু ভালোমানুষ একটা লোকের ওপর সহকর্মীদের অমন আচরণ করা উচিত নয়, লোকটা তার উপরওয়ালাদের কথা মেনে চলেছে (এ ক্ষেত্রে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা ভালো), কারো ওপর কোনো আক্রোশ নেই, ঈশ্বরে ভক্তি রেখেছে, এবং মারা গেছে (লেখক যদি একান্তই তাকে মেরে ফেলতে চান), বন্ধু-বান্ধব পরিবার-পরিজনের মনে তাতে শোক হয়েছে। লোকটাকে না মারলেই অবশ্য আরো ভালো হত। আহা বেচারা, আপিসের কোটটা না হয় সে খুঁজে পাক, হুজুর তাকে ডেকে পাঠাক, এবং তার গুণাবলী সম্পর্কে যথারীতি তদন্তের পর তার পদোন্নতি করে বেতন বাড়িয়ে দিক— ধর্মের জয় হোক, এবং ওর সহকর্মীদের মধ্যে যে অধর্ম ছিল তার শাস্তি হোক। আমি হলে এই ভাবে লিখতাম। তাছাড়া, যেভাবে লেখক গল্পটা লিখেছেন তার মধ্যে বিশেষত্ব বা প্রশংসার কি আছে? আমাদের কদর্য মেহনতী জীবনের একটা তুচ্ছ ঘটনাকেই মাত্র

তিনি বর্ণনা করেছেন। এমন একখানা বই তুমি কি করে পাঠাতে পারলে, ডার্লিং? বইটা বিষাক্ত বই, ভারেঙ্কা। একদম বানিয়ে বানিয়ে লেখা, কেন না ও রকম কেরানি হতেই পারে না। এ রকম বইয়ের বিরুদ্ধে আমার নালিশ রুজু করা উচিত ভারেঙ্কা, নিশ্চয় নালিশ করা উচিত।

তোমার বিনীত সেবক,

মাকার দেভুশ্‌কিন

২৭শে জুলাই

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

সম্প্রতি যে সব কাণ্ড হয়েছে এবং তোমার যে চিঠিগুলি পেয়েছি, তাতে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। ফেদোরা ব্যাপারটা খুলে না বললে ভেবেই পেতাম না। এমন হতাশ হয়ে অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে চাইছ কেন, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্? তুমি যে কৈফিয়ত দিয়েছ তাতে আমার মন ওঠেনি। এখন বুঝতে পারছ তো, পয়সাওয়ালা সেই চাকরিটা নেওয়া আমার উচিত ছিল কিনা। সম্প্রতি যা যা হয়েছে তাতে সত্যিই ভয় পেয়ে

গেছি। বলছ, এ সব তুমি চেপে রেখেছিলে শুধু আমায় ভালোবাসার জন্যে। তোমার কাছে আমি তো নিজেকে চিরকালই ঋণী জ্ঞান করে এসেছি, কিন্তু ভাবতাম আমার পেছনে তুমি যা খরচ করছ, সেটা তোমার ব্যাঙ্কে জমানো সঞ্চয় থেকে। এখন যখন টের পেলাম যে তোমার কোনো টাকাই ছিল না, হঠাৎ আমার অবস্থা দেখে তোমার অনুকম্পা হচ্ছে বলে তুমি আগাম আগাম বেতন নিয়ে খরচ করেছ, আমার অসুখের সময় কোটটা পর্যন্ত তোমায় বেচতে হয়েছে, তখন কি ভাবব বলো তো? কি করি এখন? সহানুভূতি এবং আত্মীয়তার খাতিরে তুমি প্রথম দিকে আমায় যা সাহায্য করেছিলে, তারপর এ সবকিছু তোমার বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। সখের জন্যে টাকা ওড়ানো তোমার উচিত হয়নি। সত্যিকারের বন্ধুর কাজ তুমি করোনি, আমাকে খুলে জানাওনি। তারপর তোমার শেষ কোপেকটিও তুমি খরচ করেছ আমার পোষাক-আষাক, সন্দেশ-মিষ্টি, থিয়েটারের টিকিট, বইপত্তর আর ফুর্তির জন্যে, এ কথা টের পেয়ে আমার ক্ষমাহীন অবিবেচনার জ্বালায় জ্বলে মরছি এখন (তোমার কি দরকার না দরকার তা না ভেবেই তো এ সব উপহার আমি গ্রহণ করেছিলাম)।

যে সব জিনিস দিয়ে তুমি আমায় আনন্দ দেবে বলে ঠিক করেছিলে, তা শুধু এখন দুঃখ আর নিষ্ফল অনুশোচনারই সৃষ্টি করেছে। ইদানীং তোমার বিমর্ষ ভাব দেখে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কিন্তু আসলে যা ঘটেছে তা যে আমার চরম সন্দেহকেও ছাড়িয়ে গেল। হায় ভগবান। বিচার-বিবেচনা তুমি কি করে অমন নিঃশেষে খোয়ালে, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্? লোকে ভাববে কি, বলবে কি? বিনয়, মিতব্যয়িতা, সহৃদয়তার জন্যে যে তুমি এত শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছ, সেই তুমি কিনা অমন জঘন্যতম একটা দুষ্কর্মের মধ্যে গিয়ে পড়লে—এদিকে তো তোমার কখনো কোনো ঝোঁক ছিল না। ফেদোরার কাছ থেকে যখন শুনলাম, মাতাল অবস্থায় রাস্তা থেকে ধরে পুলিশ তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে, তখন কি রকম লাগে বলো তো? শুনে বিশ্বাস হতে চাইছিল না যদিও সন্দেহ হচ্ছিল কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটেছে, কেন না চার দিন ধরে তুমি বাড়ির বাইরে কাটিয়েছ। তোমার আপিসের কর্তারা যখন তোমার অনুপস্থিতির আসল কারণটা জানবে তখন তারা কি বলবে সে কথা ভেবে দেখেছ, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্?

তুমি লিখেছ, সবাই তোমায় দেখে হাসছে,

আমাদের ঘনিষ্ঠতার কথা তারা জেনে ফেলেছে, তোমার প্রতিবেশীরা প্রায়ই আমার নাম নিয়ে ছড়া কাটে। ভগবানের দোহাই মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, ওদিকে মোটেই কান দিয়ো না, নিজে একটু সুস্থির হও। অফিসারদের সঙ্গে তোমার যে কাণ্ডটা হয়েছে তা নিয়েও শঙ্কিত হয়ে আছি। কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে ইতিমধ্যেই। কি হয়েছে, বলো ? লিখেছ, সত্যি কথা সবখানি বলতে তোমার সাহস হয়নি, ভয় পেয়েছিলে আমার বন্ধুত্ব বুঝি হারাবে। লিখেছ, তুমি হতাশ হয়ে পড়েছ, কি করে আমায় সাহায্য করবে, হাসপাতালের বাইরে কি করে আমাকে রাখবে ভেবে পাচ্ছ না লিখেছ, যত পেরেছ টাকা ধার করেছ তুমি, বাড়িউলীর সঙ্গে বিছছিরি ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে। কিন্তু এ সব কথা গোপন করে যা করেছ তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হয় না। এখন তো জানতেই পারলাম। তোমার দুঃখ-কষ্টের কারণ যে আমি, এইটে তুমি আমাকে দেখতে দিতে চাওনি। কিন্তু আসলে তোমার এ আচরণে যে আমার দুঃখই দ্বিগুণ করে তুলেছে। এ যে একেবারে সর্বনাশ, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। বন্ধু আমার, দুর্ভাগ্য বড়ো ছোঁয়াচে। যারা গরিব দুঃখী, তাদের উচিত পরস্পরের কাছ থেকে

দূরে সরে থাকা, নইলে দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া লাগে। তোমার মিতাচারী নির্জন জীবনের মধ্যে কখনো যা ঘটেনি সে বিপদ আমিই টেনে এনেছি। এ চিন্তাও আমার অসহ্য।

খুলে বলো, ঠিক কি হয়েছে তোমার, কেমন করে এ অবস্থা ঘটল। সম্ভব হলে কিছু সান্ত্বনার কথাও আমাকে বোলো। স্বার্থপরের মতো কথাটা বলছি তা নয়, বলছি আমার বন্ধুত্বের আর ভালোবাসার জন্যে— আমার হৃদয় থেকে সে বন্ধুত্ব কিছুতেই মুছে যাবার নয়। বিদায়! জবাবের জন্য অধীর হয়ে রইলাম। আমাকে যা ভেবেছ, তা ভাবা তোমার উচিত হয়নি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্।

স্নেহের,

ভার্‌ভারা দব্রসিওলভা

২৮শে জুলাই

ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না কল্যাণীয়াসু!

যেহেতু যা হবার তা চুকে গেছে এবং আমার জীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে, সেই হেতু তোমার জ্ঞাতার্থে বলতে পারি: লোকে কি ভাববে এই জন্যে

তোমার উদ্বেগের কারণ নাই, কেন না তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, দুনিয়ায় আমার সব থেকে বেশি প্রিয় হল আমার মর্যাদা। সে কারণে অত্রপত্রে আমার শৈথিল্য ও দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করে আমি বলি যে আমার উপরিওয়ালারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না* এবং জানতেও পারবে না। সুতরাং আগের মতোই তারা আমাকে শ্রদ্ধা সহকারে দেখছে। শুধু একটা জিনিস আমাকে উদ্বিগ্ন করছে: গুজব। তোমার দশ রুবলের ফলে বাড়িউলীর চিল্লানি কমে এসে অনুচ্চ গাঁইগুঁইতে দাঁড়িয়েছে—ও টাকায় আমার বকেয়া ভাড়ার একটা অংশ শোধ করে দিয়েছি। আর যারা আছে, তারা কোনো গণ্ডগোল করবে না, গণ্ডগোল করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে ফের টাকা ধার করার চেষ্টা না করছি। অবশেষে আমার ব্যাখ্যা সমাপ্ত করব এই উক্তি দিয়ে: তোমার চোখে আমার সম্মানের চেয়ে দুনিয়ায় আর কিছুই আমার বেশি প্রিয় নয়, আমার সাময়িক যা কিছু দুর্ভোগ তা সব এতে পুষিয়ে যাবে। যাক, ঝড়ের প্রথম ঝাপটাটা গেছে এবং আমি তোমায় চলে যেতে দিইনি, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে এই সব কাণ্ড করেছি, তোমার বিচ্ছেদ আমার অসহ্য তার জন্যে এবং তুমি আমাকে কপট বন্ধু ও স্বার্থপর

ব্যক্তি বলে ভাবছ না এইজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আমি কাজে লেগেছি, সুন্দরভাবে আমার কর্তব্য-কর্ম পালন করছি। গত কাল এভ্স্তাফি ইভানভিচের চোখে পড়েছিলাম, কিন্তু একটি কথাও তিনি আমায় বলেননি। এ কথা অবিশ্যি লুকোব না ডার্লিং, যে দেনার দায়ে এবং পোষাক-আষাকের দিক থেকে আমার দশা সঙ্গীন। কিন্তু সেটা সত্যিই বিশেষ কিছু নয়— কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না। পঞ্চাশ কোপেকী যে আধুলিটা তুমি পাঠিয়েছ সেটা মর্মান্তিক বিঁধেছে। কোন অবস্থায় এসে ঠেকেছি! এমন বুড়ো বোকা আমি, কোথায় তোমায় আমি সাহায্য করব না তুমি আমার অসহায় অনাথিনী—তুমি সাহায্য করতে শুরু করেছ আমাকে। আপাতত কিছুকাল টাকা পাবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। দেখলে তৎক্ষণাৎ তোমায় জানাব। টাকা জোগাড় করে ফেদোরা ভালোই করেছে। কিন্তু ঐ গুজব— ওইটাই আমায় সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছে। বিদায়, আমার রাণী, তোমার ছোট্টো হাতখানিতে চুমু দিয়ে প্রার্থনা করি, শীগগির ভালো হয়ে ওঠো। সবিস্তারে সবকিছু লিখতে পারলাম না, কেন না আপিসে যাবার তাড়া

আছে। কাজে যা অবহেলা ঘটেছে তা পুষিয়ে দিতে হবে। অন্যান্য আর সব ঘটনা এবং অফিসারদের সঙ্গে আমার ঝামেলার বিষয় লিখে জানাব সন্ধ্যেয়।

তোমার সশ্রদ্ধ ও স্নেহময় বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

২৮শে জুলাই

আ, ভারেঙ্কা, ভারেঙ্কা আমার!

আমি নই, এবার উচিত তোমারই লজ্জা পাওয়া। চিরকাল এটা তোমার বিবেকে বিঁধে থাকবে। তোমার শেষ চিঠিটা পড়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মনের ভেতরটা তন্নতন্ন করে দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছি, আমি ঠিকই করেছিলাম, একদম ঠিক। ওই সেই মাতলামির কথাটা অবিশ্যি বলছি না (ও নিয়ে যথেষ্ট হয়েছে ডার্লিং, যথেষ্ট), বলছি, আমি যে তোমার প্রতি অনুরক্ত সেটা মোটেই আমার পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতা নয়, মোটেই নয়। তুমি ডার্লিং, এর কিছুই জানো না। কেন অনুরক্ত না হয়ে পারি না তা যদি সত্যিই

জানতে, তাহলে যে সব কথা তুমি বলেছ তা বলতে না। ও সব কথা তুমি বলেছ শুধু তোমার মাথা থেকে, নিশ্চয় জানি, তোমার হৃদয় অন্য কথা বলবে।

সত্যি বলতে কি ডার্লিং, ঐ অফিসারগুলোর সঙ্গে আমার ঠিক কি হয়েছিল তা একদম মনে নেই আমার। অবিশ্যি মানতেই হবে, আমি ভারি একটা মুশকিলের মধ্যে পড়েছিলাম। গোটা মাসটা ধরে আমি যেন শূন্যে ঝুলে থেকেছি, যেন শুধু একটি সুতো ভরসা। ভারি বিছছিরি অবস্থা। তোমার কাছ থেকে এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার বাড়িউলী ভয়ানক সোরগোল তুলে বসল। তাতে পরোয়া করিনি বৈকি। চ্যাঁচাক না বুড়ি ডাইনী কত চ্যাঁচাবে। কিন্তু প্রথমত, ব্যাপারটা হল গে লজ্জার, তাছাড়া ভগবান জানেন, বুড়ি কি করে যেন আমাদের চিঠিপত্রের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল এবং এমন চিৎকার জুড়ল যে আমি কানে আঙুল দিয়ে রইলাম। দুর্ভাগ্যবশত, অন্যেরা কান বন্ধ না করে বরং কান আরো খাড়া করে শুনতে লাগল। এখনো পর্যন্ত ভাবলে এত লজ্জা করে...

এই ভাবে ভারেঙ্কা, দুর্ভাগ্যের চাপে আমি প্রায় শেষ। তার ওপর ফেদোরার কাছে শুনলাম, কোন এক

হতভাগা তোমাদের বাসায় গিয়ে জঘন্য সব প্রস্তাব করে তোমায় অপমান করে গেছে। এতে তোমার যে কতখানি লেগেছিল তা আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার নিজেরই কষ্ট থেকে। এই শুনেই ভারেঙ্কা, মাথাটা আমার বিগড়ে গেল — একেবারে চরমে চলে গেলাম। অস্বাভাবিক ক্রোধে ছুটে বেরিয়ে গেলাম সোজা একেবারে সেই পাজী হতভাগাটার বাসার দিকে। আমি যে কি করতে চলেছি খেয়াল ছিল না, কিন্তু তোমার অপমান সইতে পারছিলাম না। সবকিছুই ভারি বেদনার্ত লাগতে লাগল, এবং অবস্থা আরো কাহিল করে তোলার জন্যেই যেন বৃষ্টি পড়ছিল — রাস্তাগুলো ছিল ভারি ভেজা আর পিছল — ভারি বেদনার্ত এবং নিরুৎসাহ!... আমি আমার সিদ্ধান্ত প্রায় বদলে নিয়ে ফিরে যাব ... এমন সময় সব ভেস্তে গেল। দেখা হয়ে গেল এমেল্যা অর্থাৎ এমেলিয়ান ইলিচের সঙ্গে। লোকটা কেরানি, মানে বরখাস্ত হবার আগে পর্যন্ত কেরানি ছিল — এখন কি করে সংসার চালায় তা আমি বলতে পারি না। যাই হোক, একই পথ ধরে চললাম আমরা দুটিতে। তারপর — কিন্তু ভারেঙ্কা, তোমার বন্ধুর দুর্ভাগ্য আর প্রলোভনের কাহিনী শুনে কি আনন্দ তুমি পাবে? তৃতীয় দিনের সন্ধ্যেয় এমেল্যার

পাল্লায় পড়ে গিয়ে দেখা করলাম সেই অফিসারের সঙ্গে। ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিলাম দরোয়ানের কাছ থেকে। অফিসারটার কথা বলতে মনে পড়ল, অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম লোকটার মধ্যে কিছু গণ্ডগোল আছে। ও যখন আমাদের বাড়িতে থাকত তখনই লক্ষ্য করেছিলাম। এখন বোঝা যাচ্ছে অবিবেচনার কাজ করেছিলাম, কেন না যখন ঘোষণা করা হল আমি এসেছি, তখন সত্যি কথা বলতে কি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। কিছুই মনে পড়ছে না ভারেঙ্কা, শুধু এইটুকু মনে পড়ছে যে ঘরখানা অফিসারে ভর্তি—কিংবা ভগবান জানেন, হয়ত আমি এক একজনের বদলে দু'দুজন করে দেখছিলাম। ঠিক কি বলেছিলাম মনে নেই, কিন্তু পবিত্র ক্রোধাবেগে অনেক কিছুই যে বলেছিলাম তা ঠিক। তাতে ওরা আমায় ঘর থেকে বার করে দিলে, এমন কি, সিঁড়ির ওপর থেকে ছুঁড়েও ফেলে দিলে। ঠিক ছুঁড়ে ফেলেছিল বলা যায় না, ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করে দিয়েছিল। কি করে বাড়ি ফিরেছিলাম সে তো তুমি আগেই জেনেছ। এই হল গে বৃত্তান্ত! আমার অপমান ওরা করেছে বটে, আমার মান-মর্যাদার হানি করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হয়নি—মানে

বাইরের লোক কেউ জানে না। জানো একমাত্র শুধু তুমি, তার মানে ঘটনাটা যেন প্রায় ঘটেইনি বলে ধরা যায়। তাই না, ভারেঙ্কা? গত বছর আক্সেন্তি ওসিপভিচ্ পিওতর পেত্রোভিচের অপমান করেছিল আপিসে— এ আমি নিঃসন্দেহে জানি। কিন্তু করেছিল গোপনে, একান্ত গোপনে। প্রথমে ওকে ডেকে নিয়ে গেল দরোয়ানের ঘরে — দরজার ফাঁক দিয়ে আমি সবই দেখেছি — তারপর সেখানে এক চোট নিলে, কিন্তু ভদ্রভাবে অর্থাৎ গোপনে। আমি দেখেছিলাম, কিন্তু তাতে কি আসে যায়, কাউকে তো বলিনি। পিওতর পেত্রোভিচ্ আর আক্সেন্তি ওসিপভিচ্ তারপর চলে গেল যেন কিছুই হয়নি। পিওতর পেত্রোভিচ্ ভারি মর্যাদাবান লোক — ব্যাপারটা সম্পর্কে সেও মুখ বুঁজে রইল। এর পর ওরা হ্যাণ্ড-শেক করে পরস্পরকে অভিবাদন করলে। যাই হোক, ভারেঙ্কা, প্রতিবাদ করব না, করার সাহস নেই। হেঁট হয়ে গেছি আমি, সত্যি ভারি হেঁট হয়ে গেছি। সবচেয়ে খারাপ কথা, নিজের কাছেই হেঁট হয়ে গেছি। এ নিশ্চয় বিধাতার নির্বন্ধ। ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাতে পারে। যাক, আমার বিপদ-আপদের পুরো

কাহিনীটা তুমি শুনলে। শোনার মতো সত্যিই ওগুলো নয়। শরীরটা বিশেষ ভালো নেই, ডার্লিং। আমার স্বাভাবিক ফুর্তি যা কিছু সব গেছে। অনুমতি দাও তো আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে তোমায় আশ্বস্ত করি। চিরকাল, ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না,

তোমার বিশ্বস্ত সেবক,

মাকার দেভুশ্‌কিন

২৯শে জুলাই

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

তোমার দুটি চিঠিই পড়েছি, এবং পড়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে আছি। সত্যি বন্ধু আমার, হয় তুমি তোমার দুশ্চিন্তার কিছুটা আমার কাছ থেকে আড়াল করে রাখছ, নয় তো ... সত্যি মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, তোমার চিঠিগুলো থেকে বেশ বোঝা যায়, কিছু একটা মুশকিলে তুমি পড়েছ, সে কথা আমায় বলছ না। দয়া করে আজ অবশ্য অবশ্য আমাদের দেখতে এসো। বরং এসে আমাদের

সঙ্গে ডিনার খেয়ে যেয়ো। কি করে প্রতিদিন চালাচ্ছ, কি করে তোমার ওই বাড়িউলীর সঙ্গে চলছে, তা পর্যন্ত আমায় বলোনি। মনে হয়, ইচ্ছে করেই এ সম্বন্ধে চুপ করে আছ। বিদায়, বন্ধু, কিন্তু নিশ্চয় এসো। বরং এর পর থেকে আমাদের এখানেই তুমি প্রতিদিন খেয়ে যেয়ো। ফেদোরা রাঁধে ভালো। বিদায়।

তোমার

ভার্‌ভারা দব্রসিওলভা

১লা আগস্ট

একান্ত আপন আমার ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না!

ভগবানের কৃপায় দয়া দিয়ে দয়ার ঋণ শোধ করার সুযোগ পেয়েছ, এজন্যে নিশ্চয় তুমি ভারি সুখী হয়েছ, ভারেঙ্কা। তাতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই, কেন না তোমার হৃদয় যে কতো ভালো তা আমি নিশ্চয় করে জানি। শুধু আমায় বোকো না — মানে আমার বুড়ো বয়সে তুমি যে লাগাম ছিঁড়ে বসলে, তার জন্যে তোমায় অবিশ্যি কিছু বলছি না। তাহলে তুমি বলছ, ওটা আমার অপরাধ। তোমারই মুখ থেকে এ কথা শুনে এত ঘা

লেগেছে মনে। এ সব কথা বলছি বলে রাগ কোরো না। বুকটা আমার ভারি ক্ষতবিক্ষত হয় গেছে। গরিব হলেই খানিকটা পাগলাটে গোছের হয়। পাগলাটে হয়েই জন্মায় হয়ত। আগেও এ কথাটা আমার মনে হয়েছে, এখন আরো বেশি করে তা অনুভব করছি। গরিব লোক মাত্রেই সন্দেহ-বাতিক। দুনিয়াকে ওরা দেখে অন্য রকম করে। প্রতিটি জিনিস, প্রতিটি লোককে সে চোখের কোণা দিয়ে নজর করে চলে সসঙ্কোচে, অনবরত ভাবে, ওর সম্পর্কে কে কি বলছে—হয়ত বা বলছে, 'কি রকম গরিব হতভাগা দেখো, কি ভাবছে লোকটা? এদিক থেকে, নয় ওদিক থেকে দেখলে লোকটাকে কি বিদঘুটেই না দেখায়।' তাছাড়া ভারেঙ্কা, সবাই জানে, গরিব লোকেরা জঞ্জালের চেয়েও হীন, সকলের কাছে অশ্রদ্ধেয়—লেখকেরা যাই বলুক না কেন, ঠিক আগের মতোই সবই চলতে থাকবে। কেন জানো। কারণ সকলেরই ইচ্ছে, গরিব লোকটা তার ভেতরের সবখানি খুলে মেলে ধরুক, যাতে সবাই সবখানি দেখতে পায়, তার যেন গোপন, অলঙ্ঘ্যনীয় কিছু না থাকে। আর মান মর্যাদার কথা যদি বলো—সে গরিবের জন্যে নয়। এই তো সেদিন এমেল্যা বললে, ওর জন্যে চাঁদা তোলা

হচ্ছিল, কিন্তু প্রতিটি দশ কোপেকের জন্যে ওরা সরকারিভাবে তদারক করে দেখে যাচ্ছে, কি পেল। ওরা ভাবছিল পয়সাটা বুঝি দান করা হচ্ছে, কিন্তু দিচ্ছে তো একটি গরিব লোকের ছবি দেখার দাম হিসাবে। দান আজকাল দেওয়া হয় ভারি অদ্ভুত করে। নাকি, চিরকালই এমনি হয়ে এসেছে, কে জানে? হয়ত ওরা জানে না কি করে দান করতে হয়, অথবা হয়ত খুবই প্রচণ্ড রকমের জানে। এই হল অবস্থা, ভারেঙ্কা। অন্য অনেক বিষয়ে আমরা খুব কম জানতে পারি, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমরা জানি বেশ ভালোই কিন্তু কেন জানি, কেন ভাবি? কেন বলো তো? কারণ অভিজ্ঞতা, কেন না কাফেতে যাবার মুখে আমরা নিশ্চয়ই কোন না কোন ভদ্রলোকের দেখা পাব যিনি মনে মনে ভাবছেন, 'তাই তো, জীর্ণ পোষাকের ওই কেরানিটি আজ কি খাবে কে জানে? আমি তো সতি-পাপিলিয়ত্ খাব, আর নিশ্চয় বিনা মাখনে পরিজ খাবে ও।' আমি কি খাই না খাই তাতে ওর কি? এই রকম ভদ্রলোক সব সত্যিই আছে ভারেঙ্কা, নিশ্চয় আছে আর এ রকমের কথাই সব ভাবে। কুৎসিত সব লেখক ওরা। অনবরত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, হাঁটার সময় তুমি সসঙ্কোচে পা ফেলছ কি না, অথবা অমুক ডিপার্টমেণ্টের

অমুক এক গরিব কেরানির পায়ের জুতো ছিঁড়ে আঙুল বেরিয়ে পড়েছে কি না অথবা কোটটা তার জীর্ণ কি না তারপর বাড়ি ফিরেই সব লিখতে বসে যাবে এবং সে ভূষিমাল ছাপিয়েও ফেলবে! কিন্তু মশায়, আমার জামা ছেঁড়া কিনা তা নিয়ে আপনার মাথা ব্যথা কেন? অসৌজন্য হলে, ক্ষমা করো ভারেঙ্কা, কিন্তু গরিব লোকেরা হল গে কুমারী মেয়ের মতোই সঙ্কুচিত। অপরিচিত লোকের সামনে তুমি তোমার পোষাক খুলতে তো আর যাবে না—আমার রূঢ়তা মাফ করো, ভারেঙ্কা, তেমনি গরিব লোকটাও চায় না যে কেউ গিয়ে নাক গলাক তার কোটরে, তার পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে। আর সেই হল গে কথা! সেই জন্যেই যখন আমার শত্রুরা আমার সুনাম আর আত্মসম্মানে কালি দিল, তখন অত লেগেছিল আমার।

বেশ খানিকটা ভালুক ছানার মতো, খেঁকুরে চড়ুইয়ের মতো ব্যবহার করেছি আপিসেও। ভাবতেও লজ্জায় মরে যাচ্ছি। জামার আস্তিনটা ছেঁড়া কিংবা বোতামগুলো ঘণ্টার মতো সুতোর সঙ্গে ঝুলছে, তাতে লজ্জা না পেয়ে উপায় কি? কপাল খারাপ, আজকেই পোষাকটা ছিল সবচেয়ে বেশি ওঁছা! লোকের মন খারাপ করে দেবার পক্ষে ও পোষাকই যথেষ্ট। স্তেপান কার্লভিচ্ পর্যন্ত নজর

করলে। কি একটা কাজের কথা বলতে বলতে হঠাৎ শুরু করে দিলে, 'শোনো, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্', বাস্ আর কিছু না বলেই চুপ করে গেল। কিন্তু উহ্য কথাটুকু অনুমান করতে আমার বাধেনি—এমন রাঙা হয়ে উঠলাম যে আমার টাক মাথাটা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। ব্যাপারটা অবশ্য কিছুই নয়। কিন্তু ভারি অস্বস্তিকর, ভারি ভাবনায় পড়লাম। কিছু কি টের পেয়ে গেছে ওরা? ভগবান করুন, যেন না পায়। সত্যি বলতে কি, একটা লোককে আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে। লেখক হলে তো এ সবে কিছু আটকায় না। হতচ্ছাড়াগুলো এক কোপেক পেলেই তোমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বেচে দেবে। ওদের কাছে পবিত্র বলে কিছু নেই।

এটি কার কীর্তি তা আমি জানি। রাতাজ্যায়েভ ছাড়া আর কারো নয়। আমাদের দপ্তরের কার সঙ্গে যেন ওর আলাপ আছে। তাকে হয়ত বলে বসেছে, নানা রকম রঙও চড়িয়ে দিয়েছে হয়ত। নয় তো সে তার নিজের দপ্তরেই গল্প করে শুনিয়েছে, সেখান থেকে ছড়িয়েছে আমাদের দপ্তর পর্যন্ত। আমার প্রতিবেশীরা প্রত্যেকেই তো ব্যাপারটা সবই জানে। তোমার জানলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, এও আমি লক্ষ্য করেছি। আমি যখন কালকে তোমাদের ওখানে দুপুরের খাবার

খেতে যাই, তখন ওরা সকলেই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছে। বাড়িউলী বলছিল, ধেড়ে শয়তানটা এখন একটা কচি মেয়েকে নিয়ে পড়েছে, গালমন্দও করছিল তোমাকে। কিন্তু আমাদের নিয়ে বই লেখা এবং চাপা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বর্ণনা করা — রাতাজ্যায়েভের এ দুরভিসন্ধির তুলনায় ও সব তো কিছুই নয়। ও এই কথাই বলেছে, ভালোমানুষেরা আমাকে সাবধানও করে দিয়েছে। আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি ডার্লিং, কি আমাদের উপায়? রাণী আমার, ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দেবেন বলে ঠিক করেছেন। সময় কাটাবার জন্যে একটা বই পাঠাবে বলেছিলে। কি হবে বই দিয়ে। যাই বলো, শেষ পর্যন্ত বই আর কি? এক রাশ বকবকানি। নভেলই বা কি? অলস লোকেদের ফুর্তির জন্যে লেখা যত ছাইপাঁশ। বহু দিনের অভিজ্ঞতা থেকে এ আমার বেশ জানা। শেক্‌স্‌পীয়রের কথা তুলে ওরা যদি বলে, 'জানো তো, সাহিত্যে শেক্‌স্‌পীয়রও আছেন', তাহলেও নিশ্চয় জেনে রেখো, সেও কেবল ছাইপাঁশ। ও শুধুই কেবল ছাইপাঁশ আর পরনিন্দা, কেচ্ছার পক্ষেই ভালো।

তোমার
মাকার দেভুশ্‌কিন

২রা আগস্ট

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

কিছু চিন্তা কোরো না, ঈশ্বরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। ফেদোরা আমাদের দুজনের জন্যে প্রচুর কাজ নিয়ে এসেছে, সোৎসাহে কাজ শুরু করে দিয়েছি আমরা। হয়ত আমরা সব ঠিক করে ফেলতে পারব। ফেদোরার সন্দেহ, আমার সাম্প্রতিক দুর্ভোগের মূলে আন্না ফিওদরভ্‌নার কিছু একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু তাতে কি এসে গেল? আজ আমার আশ্চর্য খুশি লাগছে। শুনলাম, তুমি ফের টাকা ধার করার কথা ভাবছ্। দোহাই, করো না। শোধ দেবার সময় অশেষ কষ্টে পড়বে মনে রেখো, আমাদের এখানে ঘন ঘন এসো, বাড়িউলীর কথায় কান দিয়ো না। তাছাড়া, বাকি যত শত্রু আর শুভাকাংক্ষী সম্পর্কে তোমার যা ভয় সেটা অমূলক বলেই আমার বিশ্বাস, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্! বলেছিলাম, তোমার লেখার ধরণটা বড়ো এলোমেলো। এখনো তাই রয়ে গেছে। ফের দেখা হবে, আসি। আশা করে রইলাম শীগগিরই আমাদের এখানে আসবে।

তোমার

ভ. দ.

ছোট্ট রাণী আমার, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না!

সাগ্রহে তোমায় জানাই যে ফের আশার সঞ্চার হচ্ছে, জীবনাধিকা আমার। কিন্তু কি বলে তুমি চাও, যে টাকা ধার করব না? সে একেবারে অসম্ভব, রাণী আমার। এদিকে আমার হাতে কিছুই নেই, আর ওদিকে হঠাৎ যদি, ভগবান না করুন, তোমার কিছু একটা হয়ে বসে? শরীর তোমার বড়ো পলকা। সুতরাং এ কথা বলতে আমি বাধ্য যে টাকা ধার করা একান্ত জরুরী। কিন্তু যা বলছিলাম!

প্রথমত তোমায় বলি, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না, যে আপিসে আমি বসি এমেলিয়ান ইভানভিচের পাশে। যে এমেলিয়ানের কথা তোমায় বলেছিলাম, এ সে নয়। আমার মত এ হল একজন টিটুলার কাউন্সিলর*, ও আর আমিই সম্ভবত এখানকার সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী। লোকটা সহৃদয় এবং নিঃস্বার্থপর, কিন্তু কোনো আলাপ করে না, দেখায় একটি চোয়াড়ের মতো। তা হোক,

---

* আমলাতন্ত্রের চোদ্দ থাক ব্যবস্থার নিম্নতম একটি পদ।

লোকটা ভারি দক্ষ, হাতের লেখা একেবারে ইংরেজদের মতো পরিষ্কার! সত্যি বলতে কি, আমার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। মোটের ওপর, লোকটা গুণী! আমাদের মধ্যে অবশ্য তেমন কোনো বন্ধুত্ব নেই, শুধু ভদ্রতাসূচক যেটুকু না বললে নয়, তাই বলি। স্বভাবতই, পেন্সিল কাটা ছুরি চাইতে হলে, আমি বলি, 'দয়া করে ছুরিটা একটু ধার দেবেন, এমেলিয়ান ইভানভিচ্?' এমনি ধরণের কথা আর কি... কিন্তু আজ ও হঠাৎ আমায় বললে, 'কি অত ভাবছ বলো তো, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্?' মনে হল ও নিশ্চয় আমার মঙ্গলই কামনা করছে, সুতরাং সবকিছু ওকে বললাম। মানে একেবারে সব অবশ্য নয়, পরেও আর বলব না। অতটা সাহস হয়নি। শুধু বললাম যে বড়ো টানাটানি চলছে, ইত্যাদি। এমেলিয়ান ইভানভিচ্ বললে, 'তাহলে পিওতর পেত্রোভিচের কাছ থেকে কিছু ধার করো না হে? লোকটা সুদে টাকা ধার দেয়। আমি নিজেও ওর কাছ থেকে ধার নিতাম। সুদের হারও চলনসই, খুব চড়া নয়।' এ কথা শুনে ভারেঙ্কা, একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। হয়ত পিওতর পেত্রোভিচের কানে ঈশ্বর সুবুদ্ধি দেবেন, টাকাটা ও ধার দিয়েও দেবে হয়ত আমাকে। কতটা বাড়িউলীকে

দেব, কতটা দিয়ে তোমায় সাহায্য করব, নিজের জন্যেই বা কি কি জিনিস মেরামত করব তার হিসেব পর্যন্ত শুরু করে দিয়েছিলাম। জানো তো, আমার চেহারা আজকাল যা দেখায় একেবারে শোচনীয়। এই চেহারায় এখানে বসে থাকতে একেবারে মরমে মরে যাই। তাছাড়া, ভগবান ওদের ক্ষমা করুন, আমার বিদ্রূপকারীরা আমায় নিয়ে রঙ্গতামাসা করছে। হুজুরও আমাদের ডেস্কের সামনে দিয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে যান। ভগবান না করুন, কিন্তু যদি হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে আমার পোষাকে, তাহলে? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উনি ভারি কড়া। উনি হয়ত চলে যাবেন, মুখে কিছুই হয়ত বলবেন না বটে, কিন্তু আমি একেবারে অপমানে মরে যাব। তাই শেষ পর্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে পিওতর পেত্রোভিচের কাছে গিয়ে হাজির হলাম—এদিকে ভয়ে মরো মরো, মনে মনে কিন্তু অনেক আশা। অথচ শেষ কালে কিনা কিছুই হল না, ভারেঙ্কা, একেবারে কিছু না। পিওতর পেত্রোভিচ্ ফেদসেই ইভানভিচের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত, আমি চুপিসাড়ে এগিয়ে ওর আস্তিনটা ধরে একটু টানলাম, মানে তাতে করে ওকে যেন ডাকাই হল, 'পিওতর পেত্রোভিচ্, শুনুন।' ও মুখ তুললে, তিরিশ রুবল আমার

দরকার ইত্যাদি কথা ওকে বুঝিয়ে বললাম। প্রথমটা মনে হল যেন আমার কথা ওর মাথায় ঢোকেনি, ফের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার পর ও হেসে উঠল, ব্যস্ তাতেই খতম। ফের আগাগোড়া সব বুঝিয়ে বলতে শুরু করে-ছিলাম, শেষ পর্যন্ত ও জিগ্যেস করলে, 'জামীন বা বন্ধক রাখার মতো কি আপনার আছে?' তারপর কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমার কথা বেমালুম যেন ভুলে গেল। ফলে একটু অপ্রস্তত লাগল। বললাম, 'না, পিওতর পেত্রোভিচ্, জামীন আমার কিছু নেই, কিন্তু মাইনে পেলেই আমি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব। ফেরত দেব নিশ্চয়ই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ফেরত দিয়ে দেব।' এই সময় কে একজন ওকে ডাকলে, আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। কিন্তু ফিরে এসে ও কলমের নিব ঠিক করতে লাগল এমন ভাবে যেন আমি বলে কেউ নেই। তাই ফের শুরু করলাম, 'কোনো রকম করেই কি হয় না, পিওতর পেত্রোভিচ্?' কিন্তু আমার কথা যেন ওর কানেই ঢুকল না। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অবশেষে ঠিক করলাম, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। আস্তিন ধরে আবার টানলাম। একটা কথাও যদি বলে? একটি কথাও বললে না। কলমের নিব ঠিক করা

শেষ করে লিখতে শুরু করে দিলে। ফলে চলে এলাম।

হয়ত ওরা সবাই খুব গুণী লোক ভারেঙ্কা, কিন্তু কি অহঙ্কারী, কি ভীষণ অহঙ্কারী সবাই, আমাদের কাছ থেকে কি ভীষণ দূরের লোক। সেই জন্যেই এ সব কথা লিখছি, ডার্লিং। শুনে এমেলিয়ান ইভানভিচ্‌ও হেসে উঠল এবং মাথা দোলাল। কিন্তু লোকটা ভালো, উৎসাহ দিলে আমায়। গুণী লোক ও, কথা দিয়েছে তার পরিচিত চতুর্দশ শ্রেণীর একজন কেরানির কাছে আমায় সুপারিশ করে পাঠাবে, লোকটা থাকে ভীবর্গ্‌স্কায়া পাড়ায়, সুদেও টাকা ধার দেয়। এমেলিয়ান ইভানভিচ্‌ বলছে, লোকটা নিশ্চয় ধার দেবে। কাল ওর কাছে যাব। যাব তো? ধার না নিলে চলবে না, বাড়িউলী আমায় প্রায় তাড়িয়ে দিতে চাইছে, খাবার বন্ধ করে দিয়েছে। বুট জোড়াও একেবারে গেছে, বোতামও কতকগুলো ছেঁড়া... কিই বা ছেঁড়া নয়। কর্তাদের কেউ যদি আমার এই শোচনীয় চেহারাটি একবার দর্শন করে, তাহলে কি যে হবে। বিপদ ভারেঙ্কা, সমূহ বিপদ!

মাকার দেভুশ্‌কিন

৪ঠা আগস্ট

সহৃদয় বন্ধু, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

যথাসত্বর সম্ভব টাকাটা ধার নিয়ো দয়া করে। এ অবস্থায় তোমার সাহায্য আমি চাইতাম না, কিন্তু কিসের মধ্যে যে আছি যদি জানতে! এ বাসায় আর আমাদের থাকা চলে না। এমন বিপদ যে তোমায় বোঝাতে পারব না, ভারি উত্তেজিত আর বিচলিত হয়ে পড়েছি! কি কাণ্ড দেখো, আজ সকালে এক ভদ্রলোক এসে ঢুকেছিলেন আমাদের ঘরে, বয়স্ক লোক—প্রায় বুড়ো, পদক আঁটা পোষাক। অবাক হয়ে ভাবছিলাম কি ওঁর দরকার। ফেদোরা গিয়েছিল বাজার করতে। উনি জিগ্যেস করলেন, কেমন আছি, কি করছি এবং উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই বলতে লাগলেন যে, উনি সেই অফিসারটির খুড়ো। ভাইপো যে আচরণ করেছে, যার ফলে সারা বাড়ি আমাদের নিয়ে কথা রটছে, তাতে তিনি ভাইপোর ওপর ভারি রেগে গেছেন। বললেন যে, ভাইপোটি একটি অকর্মণ্য অপদার্থ ছোঁড়া, বরং তিনি, খুড়ো মশাই আমাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত। পরামর্শ দিলেন, ছেলে ছোকরাদের যেন আমি পাত্তা না দিই,

পিতার মতো তিনি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁর মনের ভাবটা একেবারেই পিতৃসুলভ এবং আমায় তিনি সাহায্য করতে রাজী। সঙ্কোচে লাল হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, কি বলব জানি না, ওঁকে ধন্যবাদ দেবারও ইচ্ছে ছিল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই উনি আমার হাতখানা নিয়ে গাল ধরে আদর করতে লাগলেন! বললেন, আমি দেখতে ভারি সুন্দর, আমার গালের টোল দেখে উনি ভারি খুশি হয়েছেন (ভগবান জানেন, কেন!)। তারপর পরিশেষে আমায় চুমু খাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, বললেন, তাতে কি, উনি নিতান্তই বুড়ো মানুষ (নচ্ছার বুড়ো কোথাকার!)। ঠিক এই সময় ফেদোরা আসে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে ভদ্রলোক ফের আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, উনি আমার লজ্জাসরম এবং সুমতি দেখে শ্রদ্ধা করেন, আশা জানালেন, ওঁকে যেন বাইরের লোক বলে আমরা গণ্য না করি। তারপর ফেদোরাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে অদ্ভুত কি একটা ছুতো করে টাকাও দিতে যান। ফেদোরা অবিশ্যি নেয়নি। অবশেষে যাবার জন্যে উঠে ফের খুব আশ্বাস দিলেন এবং বললেন আবার আমায় দেখতে আসবেন এবং এক জোড়া দুলও নিয়ে আসবেন (লোকটা নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল মনে হয়)।

ভালো একটা বাসার খোঁজও দিলেন, পরামর্শ দিলেন অন্য বাসায় উঠে যেতে, সে বাসাটা তাঁর জানা, এবং তাতে আমার এক পয়সাও লাগবে না। ফের তিনি ঘোষণা করলেন যে আমায় তিনি অতিশয় পছন্দ করেছেন কেন না আমি ভারি লক্ষ্মী মেয়ে এবং বুদ্ধিমতী, দুশ্চরিত্র যুবকদের সম্পর্কে আমার সতর্ক থাকা উচিত। পরিশেষে উনি স্বীকার করলেন যে তিনি আন্না ফিওদরভ্‌নাকে জানেন, আন্না ফিওদরভ্‌না ওঁকে বলেছেন যে তিনি স্বয়ং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। এতক্ষণে আমার মাথায় ঢুকল এত কাণ্ড কিসের জন্যে, কি রকম যে লেগেছিল বোঝাতে পারব না। ও রকম অবস্থা জীবনে আমার আর কখনো হয়নি। চটে উঠে সরাসরি বলে দিলাম, ওঁর সম্পর্কে আমি কি ভাবছি। ফেদোরা আমার পক্ষ নিলে, এবং প্রায় জোর করেই ওঁকে বার করে দিলে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এটি আন্না ফিওদরভ্‌নার কীর্তি। নইলে ভদ্রলোক আমাদের সম্পর্কে জানবেন কি করে?

তোমায় মিনতি করি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, এ অবস্থায় আমায় ফেলে যেয়ো না! কিছু না কিছু টাকা ধার করো, এখান থেকে উঠে যেতেই হবে। এখানে থাকা চলে না, ফেদোরারও তাই মত। অন্তত পঁচিশ রুবল

দরকার। টাকাটা ফেরত দেব, রোজগার করে তুলব, ফেদোরা আমার জন্যে আরো কাজ নিয়ে আসবে। তাই, সুদের দিকে না চেয়ে টাকাটা যে করে পারো ধার করো। সব ফেরত দেব, ভগবানের দোহাই শুধু এখন একটু সাহায্য করো। এখন যখন তোমার নিজের অবস্থাই শোচনীয়, তখন তোমায় বিব্রত করছি, ভারি কষ্ট লাগছে, কিন্তু তুমিই যে আমার একমাত্র আশা! বিদায়, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, আমার কথা মনে রেখো, ভগবানে ভরসা রেখে যথাসাধ্য করো কিন্তু!

ভ. দ.

৪ঠা আগস্ট

আমার আদরের ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না!

অপ্রত্যাশিত এই সব আঘাতে কি ভীষণ বিহ্বল হয়ে পড়েছি আমি! এই সব বিপদে মন আমার কি ভীষণ দমে যাচ্ছে! তোষামুদে বুড়ো বদমাইসদের এই দঙ্গলটা তোমার সব শক্তি সবটা জীবন নিংড়ে নিংড়ে বার করে নেবে। ওদের পাল্লায় পড়েই আমায় কবরে যেতে হবে, ভগবানের দিব্যি কবরেই যাব! তোমার

জন্যে এখন যদি টাকা জোগাড় করতে না পারি তো তার চেয়ে মরাই আমার ভালো! আর যদি জোগাড় করতে পারি, তো সেও আমার মরণই হবে ভারেঙ্কা, নিশ্চিত মরণ। কেন না তুমি তখন পাখির মতো উড়ে পালিয়ে যাবে বাসা ছেড়ে, সে বাসায় হিংস্র প্যাঁচার হানা হয়েছে বলে। এই ভাবনাতেই আমি আকুল হয়ে উঠেছি, ডার্লিং! তার ওপর তুমি আমার সঙ্গে এই ব্যবহার কি করে করলে ভারেঙ্কা, কি করে করতে পারলে? কষ্ট হচ্ছে তোমার, অপমান আর যন্ত্রণা তোমায় বিঁধছে, আমার ছোট্ট পাখিটি, তবু তুমি ভদ্রতা করে আমায় কষ্ট দিয়েছ, অমন করুণ করে আশ্বাস দিতে গেছ যে টাকাটা তুমি ফেরত দেবে। তার মানে, সময় মত সুদ দেবার জন্যে তোমার পলকা স্বাস্থ্যটি তুমি নষ্ট করবে। এ সব কথা বলার আগে তোমার ভালো করে ভেবে দেখা উচিত, ভারেঙ্কা! খেটে খেটে সেলাই করে করে তোমার ছোটো মাথাটিকে, ব্যস্ত মিষ্টি চোখ দুটিকে নষ্ট করে স্বাস্থ্যের হানি কেন করবে? সত্যি ভারেঙ্কা, ভারেঙ্কা আমার! আমি জানি যে আমি কোনো কর্মের নই, তবু জোর করে কিছু একটা করার মতো যোগ্য আমি হবই। কিছুতেই আমায় ঠেকাতে পারবে না। বাড়তি কাজ আমি জোগাড় করব। লেখকদের লেখা

নকল করে দেব আমি, নিজেই আমি ওদের কাছে গিয়ে মিনতি করে বলব, কিছু কাজ দিন। ভালো হাতের লেখা এমন লোক নিশ্চয় ওদের দরকার, আমি জানি, দরকার। খেটে খেটে তুমি অসুখে পড়বে এ কিছুতেই আমি হতে দেব না। ঐ সর্বনাশা ইচ্ছের মতো যে তুমি কাজ করবে এ চলবে না। যে কোরে হোক, টাকাটা আমি ধার করব, আমার রাণী! মরব তবু ধার করব। বলছ, চড়া সুদ দেখে যেন পেছিয়ে না যাই। কিছু ভেবো না ডার্লিং, কিছুতেই আমি পিছব না। ব্যাক নোটের চল্লিশ রুবল আমি ধার করছি দাঁড়াও। টাকাটা তো খুব বেশি নয়—তাই না? বিশ্বাস করে ওরা আমায় কি চল্লিশ রুবল দেবে না? শুধু আমার কথার ওপর নির্ভর করে? প্রথম দৃষ্টিতেই লোকের বিশ্বাস হবে তো আমার ওপরে? মানে, আমার দিকে প্রথম তাকিয়েই একটা অনুকূল মনোভাব ওদের হবে কি না? আমার চেহারাটা একবার মনে মনে ভেবে নিয়ে বলো তো: এ সব আমার দ্বারা সম্ভব তো? তোমার কি মনে হয়? আমি ভারি নার্ভাস হয়ে আছি এখন—সত্যিই কাজটা ভারি কষ্টের! ঐ চল্লিশ রুবল থেকে পঁচিশ রুবল আমি রেখে দেব তোমার জন্যে ভারেঙ্কা, দু'রুবল বাড়িউলীর

জন্যে, বাকিটা আমার নিজের দরকারে। বাড়িউলীকে অবশ্য আরো দেওয়া দরকার, সত্যি বলতে কি, এটা তার পাওনা। কিন্তু ভারেঙ্কা, আমার প্রয়োজনগুলোর কথাও একটু ভেবে দেখো, দেখলে সত্যিই ওকে আর বেশি দেওয়া যায় না। এ নিয়ে আলোচনা করে লাভ কি, উল্লেখ করারই দরকার নেই। চাঁদির এক রুবল হলেই নতুন এক জোড়া বুটের পক্ষে যথেষ্ট। পুরনো বুট জোড়ায় কাল আপিস পর্যন্তও পৌঁছনো যাবে না বলে ভয় হচ্ছে। গলাবন্ধ রুমাল একটা হলেও ভালো হয়। আমার যেটা আছে সেটা এক বছরের পুরনো। কিন্তু তুমি তো বলেছ, তোমার এপ্রণ থেকে একটা গলাবন্ধ রুমাল আমার জন্যে করে দেবে, আর একটা ডিকিও। তাই এগুলোর জন্যে ভাবছি না। এক জোড়া নতুন জুতো আর গলাবন্ধ রুমাল কিনলেই হবে। কিন্তু বোতামগুলোর কি করি, ভারেঙ্কা? তুমি নিশ্চয় মানবে যে বোতাম ছাড়া চলে না। আমার জ্যাকেটের এক পাশের প্রায় সবকটি বোতাম গেছে! ভাবতেও ভয় হয়, হুজুর যদি এ রকম অপরিচ্ছন্নতা দেখে বলেন—কি বলবেন তা অবশ্য আমি কখনো জানব না ডার্লিং, কেন না সে কথা শোনার আগেই আমার মৃত্যু হবে, লজ্জা

ভাবনায় আমি মরে যাব! এতে আমার বাকি রইল তিন রুবল, সেটা সংসার-খরচা আর আধ পাউণ্ড তামাকের জন্যে। তামাক ছাড়া আমি পারি না, ভারেঙ্কা, আজ ন'দিন পাইপ খাইনি। তামাকটা অবশ্য তোমাকে কিছু না জানিয়ে কিনে নিতে পারতাম, কিন্তু সে কাজ বড়ো লজ্জার। তুমি অমন একটা চরম বিপদে পড়েছ আর আমি কিনা বিলাস ব্যসনে টাকা ওড়াচ্ছি। এ সব কথা লিখছি আমার বিবেক পরিষ্কার করে নেবার জন্যে, ভারেঙ্কা। অকপটে তোমায় বলতেই হবে ভারেঙ্কা, যে আমি ভারি টানাটানিতে পড়েছি। মানে, বরং বলা যায়, এ রকম অবস্থা আগে আর কখনো হয়নি। আমার বাড়িউলী আমাকে ভারি হেনস্থা করছে, এতটুকু সম্মান কেউ দেখায় না আমাকে। নানা রকম অভাব আর দেনায় জড়িয়েছি। আপিসের কেরানিদের আচরণ তো চিরকালই অসহ্য, কিন্তু ইদানীং তা আরো জঘন্য হয়ে গেছে। সকলের কাছ থেকে অবস্থা ঢেকে রাখার জন্যে প্রাণপণ করি; নিজেকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি। ঢুকি এমন ভাবে যাতে কারো নজরে না পড়তে হয়, থাকি একেবারে নিজের মনে। খুলে বলতে সাহস পাই শুধু তোমার কাছে... কিন্তু যদি টাকাটা যোগাড় করতে না

পারি, তাহলে? না, না, ভারেঙ্কা, ও কথা বরং না ভাবাই ভালো। এ সব চিন্তায় মনঃপীড়া করে লাভ কি? এ কথা তোমায় বলছি এই জন্যে যে চিন্তা কোরো না। কিন্তু হা ভগবান, না পেলে কি হবে তোমার তখন? বাসা বদল করা তোমার হবে না, আমার কাছাকাছিই থাকবে বটে তখনো—কিন্তু কোন মুখে আমি এখানে ফিরব? হতাশ হয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরব আমি। এ সব না লিখে আমার বরং দাড়ি কামিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। তাতে বোধ হয় আমাকে আর একটু ভদ্রগোছের দেখাবে, আর জানোই তো, ভদ্রগোছের চেহারা হলে ভগবানের আশীর্বাদে লোকে বিশ্বাস করে! ঈশ্বরের নাম নিয়ে বেরুতে হবে এবার!

ম. দেভুশ্‌কিন

৫ই আগস্ট

শ্রদ্ধাস্পদেষু মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

তুমি যদি হতাশ হয়ে পড়ো, তাহলে আমাদের কি দশা হবে? সত্যি, হতাশ হয়ো না! এমনিতেই যথেষ্ট মুশকিলে পড়েছি আমরা। রুপোর সিক্কায় তোমায় তিরিশ

কোপেক পাঠালাম। বেশি পাঠাতে পারলাম না। কালকে চালাবার জন্যে যা নিতান্ত না হলে নয়, তাই কিছু কিনো। ফেদোরা এবং আমার হাতে প্রায় কিছুই নেই। কাল কি করব জানি না। খুবই খারাপ মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, তাই বলে তুমি নিজে মন খারাপ কোরো না! তুমি পারলে না, বটে, কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা তো করেছিলে! ফেদোরার ধারণা, আমরা এখানেই থেকে যাই, অন্য জায়গায় চলে গেলেও ইচ্ছে করলেই তো ওরা আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে। তবু চলে যাওয়াই ভালো। আরো লেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মেজাজ পাচ্ছি না।

কি অদ্ভুত চরিত্র তোমার, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্! একটুকুতেই তুমি কি কাতর হয়ে পড়ো। এমন করলে তো তুমি কখনোই সুখী হতে পারবে না। তোমার চিঠিগুলো মন দিয়ে পড়ে দেখেছি, নিজের চেয়েও তোমার বেশি দুশ্চিন্তা আমাকে নিয়ে। অন্য লোকে বলে তোমার মনটা নরম। আমি বলি খুবই নরম। কিছু সদুপদেশ দিই মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, কিছু মনে কোরো না। আমার জন্যে তুমি যা যা করেছ তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, একান্ত কৃতজ্ঞ। কথাটা আমার সবসময়েই মনে ঘুরছে। তাহলে ভেবে দেখো, যখন

দেখি তোমার সবকিছু বিপর্যয় সত্ত্বেও—সে বিপর্যয়ের অনিচ্ছাকৃত হেতু তো আমিই—সব সত্ত্বেও তুমি আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী, কেবল আমার প্রীতির জন্যেই বেঁচে থাকতে চাও, তখন কি রকম লাগে আমার। তুমি যা করো, অন্যের বিপদ নিজের করে নেওয়া—তাতে তো তোমার সুখ কখনো হবে না। আজ আপিসের কাজের পর তুমি যখন আমায় দেখতে এসেছিলে তখন তোমার মূর্তি দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কি রকম ফ্যাকাশে আর আতঙ্কিত—যেন তুমি নও, তোমার প্রেতাত্মা। কিন্তু এমন মূর্তির কারণ? কারণ তুমি যে পাওনি তা বলার সাহস হচ্ছিল না তোমার, ভয় পেয়েছিলে আমি ভেঙে পড়ব। তারপর যখন দেখলে আমি প্রায় হাসার উপক্রম করছি, তখন কি রকম হাঁপ ছেড়েছিলে তুমি। সত্যি মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, দুশ্চিন্তা কোরো না, হতাশ হয়ো না। মিনতি করি, একটু মাথা ঠিক রাখো। দেখো, শেষ পর্যন্ত সব ভালোই হবে। নইলে, অন্যের জন্যে তুমি যা চিন্তা করো, তাতে জীবন তোমার ভারি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বিদায় বন্ধু, আমার জন্যে অত ভাবনা কোরো না, মিনতি করেই বলছি।

ভ. দ.

৫ই আগস্ট

আমার আদরের ভারেঙ্কা।

বেশ ভালো কথা তাহলে, আমার রাণী, ভালো কথা! বলছ, টাকাটা জোগাড় করতে না পারলেও কিছু এসে যায় না। ভালো কথা। যাক তোমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, প্রায় আনন্দই হচ্ছে। যেখানে আছ সেখানেই থাকবে, আমাকে—এই বুড়ো মানুষটাকে ছেড়ে যাবে না ভেবে আনন্দই হচ্ছে। সত্যি বলতে কি, তোমার চিঠি পেয়ে, যে ভাবে তুমি আমার হৃদয়াবেগের যথার্থ প্রশংসা করেছ তা দেখে খুশি লেগেছে। অহঙ্কার হয়েছে বলে এ কথা বলছি না, বলছি এই দেখে যে তুমি আমায় ভালোবাস, আমার হৃদয়ের নানা ভাবান্তর সম্পর্কে তোমার কতখানি দরদ। বেশ, কিন্তু আমার হৃদয়ের কথা বলে লাভ কি? আমার হৃদয় তো শেষ পর্যন্ত নেহাৎ আমারই হৃদয়; তবু তুমি বলেছ, যে আমি যেন দুর্বল হৃদয় না হয়ে পড়ি। ভারি সত্যি কথা, ভারেঙ্কা। হৃদয় দুর্বল হওয়া উচিত নয়। তবু, লক্ষ্মী আমার, বুটের ভাবনা যে ভাবতে হচ্ছে, কাল আপিসে পরে যাবার মতো বুট! এই হল গে মুশকিল! এই রকম চিন্তা-ভাবনায় মানুষকে মেরে

ফেলে, একেবারে মেরে ফেলে। আমার নিজের কথা ভেবে মনঃকষ্টে ভুগছি তা কিন্তু নয়। নিজের জন্যে আমি থোড়াই কেয়ার করি: ভয়ঙ্কর শীতের মধ্যেও আমি শুধু শার্ট গায়ে খালি পায়ে হাঁটতে রাজী। তাতে কি এসে যাবে আমার? আমি তো একটা নগণ্য লোক, অতি মামুলী একটা মানুষ। কিন্তু লোকে কি বলবে? বিনা কোটে রাস্তায় হাঁটছি দেখলে আমার শত্রুরা কি সব বিছছিরি কথাই না বলাবলি করবে! সেইজন্যেই লোকের একটা কোট দরকার, বুটও হয়ত দরকার। সেইজন্যেই বুঝেছ ভারেঙ্কা, বুট জোড়া দরকার আমার মান-সম্মান সুনামের জন্যে। ছেঁড়া বুটে মান-সম্মান যাবেই যাবে। এ একেবারে খাঁটি কথা, ডার্লিং! বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি টের পেয়েছি। সুতরাং তোমার উচিত ঐ সব কলমবাজ আর লিখিয়েদের কথায় কান না দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করা, এই বুড়ো মানুষটা জানে দুনিয়াটা আর দুনিয়ার মানুষগুলো কি রকম।

কিন্তু আজ যা যা হয়েছিল তোমাকে তো সব বলিনি। আজ একটা সকালে আমায় যা সইতে হয়েছে, যতটা মনঃকষ্ট গেছে, তা অন্য লোকে গোটা বছরেও সহ্য করে না। ঘটেছিল এই: সাত সকালে আমি বেরিয়েছিলাম

যাতে ওকে বাড়িতে পাওয়া যায়, আপিসেও দেরি না হয়। বৃষ্টি পড়ছিল, চারিপাশে জল জমে জমে আছে! কোটের মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে হাঁটছি আর মনে মনে ভাবছি: 'করুণাময় ঈশ্বর, আমার পাপ ক্ষমা করে অন্তত এই একটি বারের জন্যে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।' পথে যেতে একটা গির্জা পড়ল। ক্রুশের চিহ্ন দিয়ে ফের ভগবানের কাছে মিনতি করলাম আমার পাপ ক্ষমা করতে। কিন্তু তখন মনে হল, ভগবানের সঙ্গে অমন চুক্তি করা অন্যায়। তাই চিন্তায় ডুবে গিয়ে হেঁটেই চললাম, পথে কি পড়ল না পড়ল তা না দেখলাম, না কেয়ার করলাম। রাস্তাটা ফাঁকা, একজন দুজন যা হেঁটে যাচ্ছিল তারাও সবাই ব্যস্তসমস্ত উদ্বিগ্ন আর চিন্তাগ্রস্ত। আর কেনই বা উদ্বিগ্ন হবে না — এত ভোরে এই রকম বাদলায় হাঁটা! একদল ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক-পরা মজুরের সঙ্গে দেখা হল। পাজিগুলো আমায় ধাক্কা দিয়ে চলে গেল! হঠাৎ অস্থির আর নার্ভাস হয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছিল টাকা পাই আর না পাই, আর একবার এ রকম হলেই হাল ছেড়ে দেব! ভস্‌ক্রেসেন্‌স্কি ব্রিজ্ যখন পৌঁছলাম, তখন জুতোর সোলটা খুলে এল, ভারি মুশকিলে পড়লাম। এমন সময় দেখা হবি তো হ একেবারে

এর্মলায়েভের সঙ্গে—লোকটা জুনিয়র কেরানিও নয়, নিতান্ত কপি করা ওর কাজ। আমাকে দেখে ও থমকে দাঁড়াল, খাড়া হয়ে রইল উদ্‌গ্রীব হয়ে, চেয়ে চেয়ে আমায় নজর করতে লাগল এমন ভাবে যেন আমার স্বাস্থ্য পান করার জন্যে একটি পয়সা ওর চাই। মনে মনে ভাবলাম, 'বটে, আমার স্বাস্থ্য পান করতে চাও, তাই না? কিন্তু কে এখন মাথা ঘামাবে স্বাস্থ্য নিয়ে?' শরীরটা আর টানতে পারছিলাম না, কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম যদি কোনো একটা কিছুতে মনটা ব্যস্ত রাখা যায়—অন্যমনস্ক হয়ে থাকার মতো কোনো কিছু, উৎসাহ পাবার মতো কিছু একটা। কিন্তু না, একটা কিছু চিন্তাও মনে এল না আমার, শুধু কাদায় হাঁটাহাঁটি করে এমন নোংরা হয়ে গেলাম যে লজ্জায় কান্না পেল। অবশেষে দূর থেকে চোখে পড়ল একটা হলুদ রঙের কাঠের বাড়ি, দোতালায় নড়বড়ে চিলেকোঠা একখানা। ভাবলাম, 'এইটেই মার্কভের বাড়ি, এমেলিয়ান ইভানভিচ্ ঠিক যে রকম বর্ণনা দিয়েছিল, তাই্।' (সেই যে মার্কভ, যে সুদে টাকা ধার দেয়)। কিন্তু কেমন নার্ভাস লাগছিল। জানতাম যে ওটা মার্কভের বাড়ি তবু একটা পাহারাওয়ালাকে

জিগ্যেস করলাম নিশ্চিত হবার জন্যে। বললাম, 'কার বাড়ি এটা বন্ধু?' জবাবটা বন্ধুর মতো হল না— হল বদমেজাজী পাহারাওয়ালার জবাব, 'জানতে চাও? মার্কভের বাড়ি এটা।' পাহারাওয়ালাদের দরদ বলে কিছু নেই। পাহারাওয়ালার জন্যে অবশ্য কিছু যায় আসে না, কিন্তু তবু, সবটা কি রকম বিস্বাদ হয়ে গেল। জানোই তো, একটা থেকেই আর একটার সূচনা। অবস্থা গতিকে তুচ্ছ জিনিসগুলোরও কেমন একটা মানে আছে বলে মনে হয়। বারবার তিনবার বাড়িখানার সামনে দিয়ে যাতায়াত করলাম, কিন্তু ঢুকতে আর পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম, 'টাকা ও আমায় দেবে না! একেবারে অপরিচিত লোক আমি, চেহারা দেখে ও মোটেই আকৃষ্ট হবে না। তাছাড়া ব্যাপারটাও ভারি সঙ্কোচের—কিন্তু কপালে যা আছে হোক! পরে যাতে আফশোস করতে না হয় সেজন্যে ঢুকেই দেখি। খেয়ে তো আর ফেলবে না!' তাই আস্তে করে ফটকটি খুলে ঢুকলাম। কিন্তু দুর্ভোগ তখনো বাকি ছিল—হতভাগা বোকা এক বেঁটে কুকুর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচিয়ে একশা করে ফেললে! ছোটোখাটো এই সব বিছছিরি জিনিসগুলো দিয়েই একটা মানুষকে বেশ পাগলা করে দেওয়া যায়, ভয় পাইয়ে দিয়ে তার সমস্ত

সিদ্ধান্ত লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া যায়। মড়ার মতো ভয়ে ভয়ে বাড়িখানায় ঢুকেছি আর অমনি কি না এই দুর্ভোগ। চৌকাঠ পেরোতেই ধাক্কা খেলাম এক মাগীর সঙ্গে— আবছা আলোয় ওকে দেখতেই পাইনি, মেয়েটা কয়েকটি কলসীতে দুধ ঢালছিল। দুধের কলসীগুলো উল্টে গিয়েছিল অবশ্য—কিন্তু আমায় লক্ষ্য করে কি তার চিল্লানি আর তরপানি! 'কেন, কি দরকার, কি চাই তোমার এখানে!' বারে বারে শুধু ওই! এ কথা লিখছি ভারেঙ্কা, কেন না অনুরূপ অবস্থায় এই রকম ঘটনা আমার কপালে চিরকাল হবেই হবে। এই আমার নির্বন্ধ: হুড়মুড় করে ঠিক এক একটা বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়বই। হৈচৈ-এর ফলে অকুস্থলে বাড়িউলী এসে হাজির, জাতে ও ফিন, দেখতে একেবারে রাক্ষুসী বুড়ি। জিগ্যেস করলাম, 'মার্কভ ওখানে থাকে কি না?' বলে দিলে থাকে না। কিন্তু ভালো করে আমাকে দেখার পর বোধ হয় ও মত বদলালে। কেন না জিগ্যেস করলে, লোকটার সঙ্গে আমার কি দরকার। আমি বুঝিয়ে বললাম যে এমেলিয়ান ইভানভিচ্ আমায় পাঠিয়েছে এবং সবকিছুই খুলে বললাম তাকে। বললাম কাজ আছে। বুড়ি তখন তার মেয়েকে ডাকলে। মেয়েটা ঢ্যাঙা মতো, খালি পা। বললে,

'বাবাকে ডেকে দে, ভাড়াটেদের সঙ্গে ওপরে আছে।' আর আমাকে বললে, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরখানা বেশ আরামের। দেয়ালে ছবি টাঙানো — ছবিগুলি প্রায়ই জেনারেলদের। সোফা আছে, একটা গোল টেবিল, জানলায় মিনিয়োনেত্ আর বালসাম ফুলের টব। ভাবলাম, সময় থাকতে থাকতে পালানোই বোধ হয় ভালো। দৌড়ে পালাবারই উপক্রম করেছিলাম, ডার্লিং! ঠিকই করে ফেলেছিলাম পরদিন সকালে আসব — আবহাওয়াটা হয়ত তখন ভালো থাকবে, কিছু অপেক্ষা করব, দুধ উল্টে পড়বে না, দেয়ালে জেনারেলের ছবিগুলোর চেহারা দেখাবে কম রাগী... দরজার দিকে এগিয়েছি ঠিক এমন সময় ও এল। বেঁটেখাটো পাকাচুল একটা বুড়ো, ধূর্ত-ধূর্ত চোখ, গায়ে একটা তেলচিটে ড্রেসিং গাউন, কোমরের কাছে একটা রশি দিয়ে বাঁধা। কি চাই জিগ্যেস করায় এমেলিয়ান ইভানভিচ্, চল্লিশ রুবল ইত্যাদি সব কথা বলতে শুরু করেছিলাম, হঠাৎ থেমে গেলাম। ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, হল না। বললে, 'টাকাটা আপনার জরুরী দরকার, কিন্তু আমার কাছে তো নেই। তাছাড়া জামীন বন্ধক হিসেবে কি দেবেন?' বুঝিয়ে বললাম যে জামীন বন্ধক দেবার

মতো কিছু নেই কিন্তু ফের এমেলিয়ান ইভানভিচের কথা বললাম এবং ফের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে টাকাটার খুবই জরুরী দরকার। ও বললে, 'এর সঙ্গে এমেলিয়ান ইভানভিচের কি সম্পর্ক? টাকা আমার নেই।' তা তো থাকবেই না, আমি ভাবলাম। আগে থেকেই তো তা আমি জানি। ওহ্ ভারেঙ্কা, ধরণী দ্বিধা হয়ে যদি তখন আমায় গ্রাস করতে পারত! পা দুটো আমার যেন পাথর হয়ে গেল, হিম নামতে লাগল শিরদাঁড়া বেয়ে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে, ও আমার দিকে তাকিয়ে—ওর চোখ দুটো যেন বলছে, 'তাহলে প্রস্থান করুন বন্ধু, উপায় কিছু নেই।' ব্যাপারটা যদি নিতান্ত ব্যবসায়ীক ব্যাপার না হত তাহলে আমি একেবারেই বিব্রত হয়ে পড়তাম। 'টাকাটা আপনার কেন দরকার?' (ও একেবারে এই কথাই জিগ্যেস করে বসল, ডার্লিং!) চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে না চেয়ে মুখ খোলার উপক্রম করলাম। কিন্তু ও শুনছিল না। পুনরুক্তি করলে, 'না, আমার টাকা নেই, দুঃখিত।' কিন্তু আমি খুব ধরাধরি করতে লাগলাম, প্রতিশ্রুতি দিলাম, টাকাটা ঠিক সময়েই শোধ দেব, এমন কি সময় হবার আগেই শোধ দিয়ে দেব, যে সুদ ও চাইবে সেই সুদই দেব। অল্প একটু টাকাও কি ও

দিতে পারে না? সে সময় আমি শুধু তোমার কথা ভাবছিলাম ডার্লিং, তুমি আমায় যে আধ রুবলটা দিয়েছ, যে সব বিপদ এবং সমস্যায় আমরা পড়েছি তার কথা। ও পুনরপি বললে, 'না। সুদের কথা বলবেন না, জামীন বন্ধক দিতেই হবে। টাকা আমার নেই। ভগবানের দিব্যি, আমি দুঃখিত।' ভগবানের দিব্যি! ডাকাত কোথাকার, কেন মিছিমিছি ভগবানের নাম নেওয়া!

কি করে যে বাড়ি থেকে বেরুলাম, ভীবর্গ্ স্কায়া পাড়া আর ভস্ক্রেসেন্স্কি ব্রিজ্ কি করে পার হলাম সত্যি মনে নেই আমার। হয়রান হয়ে, ঠাণ্ডায় জমে আপিস পেঁৗছলাম দেরি করে, দশটার সময়। পোষাকটা একটু বুরুশ করে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দারোয়ান স্নেগিরিওভ কিছুতেই দিলে না। ওর ভয় হয়েছিল বুরুশটা বুঝি আমি নষ্ট করে ফেলব, বুরুশটা আপিসেরই সম্পত্তি কিনা। অতএব বুঝতে পারছ ভারেঙ্কা, ময়লা সাফ করা ন্যাকড়ার চেয়েও খারাপ ব্যবহার করছে ওরা আমার সঙ্গে। টাকার অভাব নয়, এইটেই আমাকে মারছে ভারেঙ্কা, এই যন্ত্রণা, এই হাসি, ঠাট্টা, ইশারা। দৈবাৎ যদি এ সব কিছু হুজুরের কানে যায়! তাহলে? দুর্দিন শুরু হয়েছে আমার!

তোমার সমস্ত চিঠিগুলো আজ ফের পড়ে দেখলাম, ডার্লিং। ভারি মন খারাপ হয়ে যায়। বিদায় ভারেঙ্কা! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!

ম. দেভুশ্‌কিন

পুঃ আমার দুর্ভোগের কথা আমি একটু মজা করে বর্ণনা করব বলে স্থির করেছিলাম। কিন্তু ঠিক সে রকম হল না। ভেবেছিলাম তুমি একটু আনন্দ পাবে। তোমার সঙ্গে দেখা করব। নিশ্চয় কাল দেখা করতে যাব তোমার সঙ্গে, নিশ্চয়।

১১ই আগস্ট

আদরের ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না!

আমার দফা শেষ। আমাদের দুজনেরই দফা একেবারে রফা। সব ধ্বংস হয়েছে আমার—আমার মান, আমার সম্মান। আমার সর্বনাশ হয়েছে এবং তোমারও সর্বনাশ টেনে এনেছি, ডার্লিং। তোমার সর্বনাশের হেতুও আমিই। ওরা আমায় জ্বালাতন করে মারছে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে আমায় নিয়ে। বাড়িউলী এমন কি আমায় অভিশাপ পর্যন্ত দিয়েছে। সত্যি সত্যিই সে আমায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে

গালাগালি দিয়েছে, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যেন আমি একটা জঞ্জাল। আর রাতাজ্যায়েভের পার্টিতে কে একজন তোমায় লেখা আমার চিঠির একটা খসড়া জোরে জোরে পড়ে শুনিয়েছে—খসড়াটা আমার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আমাদের নিয়ে কি ঠাট্টাই না ওরা করছে, কত কি না বলছে। বেইমানগুলো হেসে আর বাঁচে না। ঘরের মধ্যে ঢুকে আমি রাতাজ্যায়েভকে কপট বন্ধু আর বেইমান বলে ধিক্কার দিয়ে এসেছি। কিন্তু ও উল্টে আমাকেই শুনিয়ে দিয়েছে আমি নিজেই বেইমান, প্রেমলীলার নাগর। এখন সকলে আমায় 'লাভ্লেস' বলে ডাকে, যেন আমার অন্য নাম নেই। বলেছে আমি একটি ভিজে বেড়াল এবং একখান মিঃ লাভ্লেস। কি সর্বনাশ ডার্লিং, তোমার আমার সম্পর্কে যা জানবার ওরা সব জেনে ফেলেছে। ফালদোনি পর্যন্ত ওদের দলে ভিড়বে ভাবিনি। মুদির দোকানে গিয়ে কি একটা জিনিস কিনে আনতে বলায় ও বললে, পারবে না, খুব ব্যস্ত। আমি বললাম, 'কিন্তু এটা তোমার ডিউটি।' ও বললে, 'না, ডিউটি নয়, কেন না ভাড়া আপনি দেন না।' বোকা একটা চাষার কাছ থেকে এ অপমান সইতে না পেরে ওকে বলেছিলাম, বুদ্ধু কোথাকার। কিন্তু ও কি বললে,

জানো ? যে বলে সেই বুদ্ধু! বিশ্বাস হচ্ছিল না ও প্রকৃতিস্থ। 'মদ খেয়েছ তুমি, মাতাল, মুঝিক কোথাকার।' ও জবাব দিলে, 'তোমার পয়সায় তো খাইনি। খোয়ারি ভাঙার মতো এক ঢোক মদের পয়সাও তো তোমার নেই! ভদ্রমহিলার কাছ থেকে দশ দশ কোপেক ধার করার চেষ্টা কে করেছে?' এর ওপরে সে বলে দিলে, 'ভারি ভদ্রলোক হয়েছ তুমি!' এই অবস্থায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি, ভারেঙ্কা! বেঁচে থাকতে লজ্জা করে! একটা অচ্ছুৎ, বিনা পাস্‌পোর্টের একটা হাঘরের মতো লোকে ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে। কি দুর্ভোগ! দফা আমার শেষ, ভারেঙ্কা! উদ্ধারের কোনো আশা নেই!

ম. দ.

১৩ই আগস্ট

বিপদের উপর বিপদ, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্! কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। কি হবে তোমার? কি করে এখন তোমায় আমি সাহায্য করি। আজ ইস্ত্রিতে আমার বাঁ হাতটা জখম হয়েছে। ফসকে গিয়ে আঙুলগুলো থেঁতলে পুড়ে গেছে। কি করি এখন। আমি কাজ করতে

পারছি না, ফেদোরাও তিন দিন থেকে অসুখে। ভয়ানক দুর্ভাবনায় পড়েছি। চাঁদির খুচরোয় তিরিশ কোপেক পাঠালাম; এই আমাদের প্রায় যা কিছু তহবিল। ভগবান জানেন, তোমায় আরো দিতে পারছি না বলে আমার কি হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে! বিদায় প্রিয় বন্ধু! আজ যদি আমাদের এখানে আসো, তাহলে অনেক সান্ত্বনা পাব।

ভ. দ.

১৪ই আগস্ট

মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

কি হয়েছে তোমার? ধর্মভয় কি সবই হারিয়েছ? আমায় তুমি পাগল করে দেবে। লজ্জা করে না তোমার, নিজেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলছ যে! একবার তোমার মান-সম্মানের কথা ভেবে দেখো। তুমি সৎ, সম্ভ্রান্ত মান-মর্যাদার একটা লোক! কি করে এ কাণ্ড করলে? আপিসে যদি শোনে তা হলে কি হবে বলো তো? লজ্জায় মরে যেতে হবে তোমায়! তোমার পাকা চুলের কথা ভাবো, ধর্মভয় সব হারিয়ো না! ফেদোরা বলছে, সে তোমায়

আর সাহায্য করবে না। আমিও না। তোমার জন্যে কি অবস্থায় পড়েছি: তুমি কি ভাব, তোমার আচরণে আমার কিছু এসে যায় না? জানো না, তোমার জন্যে কি আমায় সইতে হয়। সাহস করে সিঁড়িতে পর্যন্ত যেতে পারি না—সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে আঙুল দেখায়, কত রকমের যে কথা বলে। বলে, একটা মাতালের সঙ্গে জুটেছি! অসহ্য লাগে শুনতে! তোমায় যখন ওরা ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসে, তখন লোককে বলতে শুনেছি, 'কেরানিটাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল আবার!' লজ্জায় আমার কান্না পাচ্ছে। ভগবানের দিব্যি, এখান থেকে আমি উঠে চলে যাব। বরং চাকরানির কাজ করব, ধোপানীর কাজ করব, কিন্তু এখানে আর নয়।

বলেছিলাম এসে দেখা করে যেয়ো। কিন্তু আসোনি। আমার অনুরোধ-উপরোধ, চোখের জল—তাতে কিছুই তোমার যায় আসে না, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্! আর টাকাই বা পেলে কোথায় ভেবে পাচ্ছি না? দয়া করে নিজের সম্পর্কে সাবধান হও। নিজেকে নষ্ট করে ফেলছ! কিন্তু কেন? কি লজ্জার কথা, শুনলাম তোমার বাড়িউলী তোমায় ঘরে ঢুকতে দেয়নি, বারান্দায় রাত কাটাতে হয়েছে। ছি ছি! এ কথা শুনে আমার এমন মনে হচ্ছিল।

আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেয়ো! এলে আনন্দ পাবে। একসঙ্গে বসে বসে আমরা পড়ব, পুরনো দিনের স্মৃতি নিয়ে ভাবব। যে যে তীর্থস্থান ফেদোরা দেখেছে, তার গল্প করে সে শোনাবে। এবং ভগবানের দোহাই প্রিয় বন্ধু, নিজেকে আর আমাকে ধ্বংস করে ফেলো না। আমি বেঁচে আছি শুধু তোমার জন্যেই, তোমার জন্যেই এখানে থেকে গেছি। মান-মর্যাদা হারিয়ো না, দুঃখে শক্ত হয়ে থাকো, মনে রেখো গরিব হওয়া কিছু অপরাধ নয়। অত হতাশ হবার কি আছে? বিপদ-আপদ তো আর চিরকালের নয়! ঈশ্বর করুণাময়, আমাদের দুর্ভোগও কেটে যাবে। কিন্তু তোমায় যে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। কুড়ি কোপেকি সিক্কা পাঠালাম একটা — তামাক কিংবা এই মুহূর্তে যা দরকার কিনো। কিন্তু দোহাই, বাজে নেশায় খরচ করে বসো না। দয়া করে দেখতে এসো আমাদের। তোমার যা স্বভাব, হয়ত দেখা করতে লজ্জা পাচ্ছ কিন্তু মিছে লজ্জা কোরো না। তোমার মেকি গর্বটুকু পরিত্যাগ করে সত্যি করেই অনুতাপ কোরো। ঈশ্বরে ভরসা রেখো, তিনি যা করবেন মঙ্গলের জন্যেই করবেন।

ভ. দ.

ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না, মধুময়ী আমার।

সত্যিই লজ্জিত, ভারেঙ্কা আমার, লজ্জায় মুখ তুলতে চাই না। কিন্তু প্রসঙ্গত বলি, সত্যিই কি ক্ষতিটা হয়েছে? মাঝে মধ্যে দু একবার মন ফুর্তি করে তুললে ক্ষতি কি? তাতে করে ভুলে যেতে পারি যে আমার জুতোর সোলটা ভালো নয়, কেন না ভেবে দেখলে সোলগুলো হল অর্থহীন, যাই বলো আর যাই করো, সোল চিরকালই মামুলী, ইতর এবং নোংরা হয়েই থাকবে। বুটের কথা ভাবাও অর্থহীন! গ্রীস দেশের জ্ঞানীগুণীরা যদি বিনা বুটে চলে ফিরে বেড়াতে পারতেন তাহলে অপদার্থ এই সব জিনিস নিয়ে আমরাই বা ব্যতিব্যস্ত হই কেন? তাহলে কি কারণে লোকে আমায় নিয়ে মজা করবে। আমায় অপমান করবে? যা লিখেছ তার চেয়ে অন্য কিছু ভালো কথা কি লেখার ছিল না, ডার্লিং? আর আমার হয়ে ফেদোরাকে বলে দিয়ো, ও হল গে একটি অবিবেচক মাগী, একটি গণ্ডগোলে রাক্ষুসী মাগী—এবং তদুপরি নির্বোধ, অত্যন্ত নির্বোধ। আর আমার পাকাচুলের কথা যা বলেছ সেটা তুমি ভুল করেছ,

ডার্লিং। যা ভাবছ অত বুড়ো আমি নই। এমেল্যা তোমায় অভিবাদন জানিয়েছে। তুমি লিখেছ, আমার কারণে তুমি ভেঙে পড়েছ, কেঁদেছ। আমিও লিখি যে তোমার কারণে আমিও ভেঙে পড়েছিলাম, কেঁদেছিলাম। পরিশেষে, তোমার স্বাস্থ্য আর মঙ্গল কামনা করি। আমার কথা— আমি সুস্থই আছি, ভালো আছি এবং চিরকাল

তোমার বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

২১শে আগস্ট

প্রিয় ও মাননীয়া বন্ধু, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না!

নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে, ডার্লিং, কিন্তু কি লাভ তাতে, কেন না ও দুষ্কর্ম করার আগেও নিজেকে যতটা অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল সেটা এখনকার চেয়ে কম নয়। যাই বলো না অপরাধ—চেতনা সত্ত্বেও আমার অধঃপতন হল। আমি দুষ্ট লোক নই ডার্লিং, হৃদয় আমার নির্দয় নয়। তোমায় আঘাত দিতে হলে হিংস্র বাঘের মতো একটা হৃদয় দরকার। আমার হৃদয়টা কিন্তু মেষের মতো। আর তুমি জান, হিংস্র হয়ে ওঠার দিকে আমার মোটেই ঝোঁক নেই। সুতরাং ভারেঙ্কা, দোষটা

নিতান্ত আমার নয়, কিংবা আমার হৃদয় বা মনের নয়। কার যে দোষ তা বলা আমার সাধ্যের বাইরে: ব্যাপারটা ভারি আবছা! তুমি আমায় রুপোর খুচরোয় তিরিশ কোপেক পাঠিয়েছিলে, পরে আরো কুড়ি কোপেক। তোমার মতো গরিব অনাথিনীর ওই পয়সাগুলোর দিকে আমি চেয়ে চেয়ে বসেছিলাম — মনটা বেদনায় ভরে উঠেছিল। তোমার হাত পুড়ে গেছে, কাজ করতে পারবে না, শীগগিরই উপোস দিতে হবে, তবু তামাক কেনার জন্যে তুমি পয়সা পাঠিয়েছ। কি করে বসেছি আমি? গরিব এক অনাথিনীর টাকা কেড়ে নিচ্ছি ডাকাতের মতো। বিবেকে বাধছে না? ভারি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ডার্লিং। মানে, প্রথমে মনে হল আমি একটা অপদার্থ, আমার বুটের সোলটার চেয়ে মোটেই ভালো কিছু নই। সুতরাং আমিও কিছু একটা কেউ কেটা — নিজেকে এ রকম গণ্য করা আমার কাছে মনে হল হাস্যকর। বরং স্থির করলাম, নিজেকে গণ্য করা উচিত অপদার্থ বলে, এমন কিছু যা অশোভন এমন কি কদর্য। নিজের সম্পর্কে আত্মসম্মান হারাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার যা কিছু সদ্‌গুণ এবং কৃতিত্ব তাও অস্বীকার না করে উপায় রইল না। এতেই শেষ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী পতন ঘটল আমার! কিন্তু কি জানো, এ সবই হল ভাগ্য। আমার

দোষ ছিল না। প্রথমত আমি নিজেকে একটু তাজা করে নেবার জন্যে বাইরে বেরুলাম এবং একটা থেকে শুরু হল আর একটা। প্রকৃতিটা ভারি বিষণ্ণ, ঠাণ্ডা আবহাওয়া, বৃষ্টি, তার ওপর রাস্তায় দেখা হল এমেল্যার সঙ্গে—লোকটা সবই বাঁধা দিয়ে বসেছে, ভারেঙ্কা। যা কিছু ওর ছিল সবই গেছে একই গহ্বরে, দু'দিন থেকে কিছু খায়নি। এখন সে বাঁধা দিতে এসেছে এমন একটা বস্তু যা বন্ধক রাখা যায় না। সত্যি ভারেঙ্কা, আমার নিজের লোভের বশে তত নয়, লোকটার জন্যে দয়া আর সহানুভূতির ফলেই সায় দিয়ে বসলাম। এই করেই অপরাধ করে বসলাম আর কি। কি কান্নাই আমরা কেঁদেছি, ও আর আমি—আর মনে পড়ছিল তোমার কথা। লোকটা ভালো মানুষ—ঐ এমেল্যা, ভেতরটা ওর নরম, দয়ামায়া ভরা।

এ সব অনুভূতি আমার আছে—সেই জন্যেই আমার কপালে এই সব দুর্ঘট ঘটে, ঘটে কারণ আমার অনুভূতি আছে। তোমার কাছে আমার কত ঋণ তা আমার জানা আছে, ডার্লিং। তোমাকে জেনে আমি নিজেকে আরো ভালোভাবে জেনেছি, তোমায় ভালোবাসতে শিখেছি। তার আগে, আমার রাণী, দুনিয়ায় আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ, সেটা বেঁচে থাকা নয়, যেন ঘুমিয়ে থাকা। সে সময়

আমার শত্রুরা বলত, আমার চেহারাটা পর্যন্ত আগাগোড়া বিদ্‌ঘুটে, আমায় তারা এমন ঘেন্না করত যে নিজের সম্পর্কে আমারও ঘেন্না ধরে গেল। ওরা বলত, আমি বোকা, ফলে আমিও নিজেকে ভাবতে লাগলাম বোকা। তারপর তুমি যখন আমার সামনে উদয় হলে, আমার সেই অন্ধকার জীবনে আলো নিয়ে এলে, আলো নিয়ে এলে আমার হৃদয় আর আত্মায়—তখন অবশেষে শান্তি পেয়েছিলাম আমি, টের পেয়েছিলাম অন্যের চেয়ে আমি হীন নই। হয়ত আমার ওপরকার পালিশ নেই, আমেজ আর ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু হৃদয় মনের দিক থেকে আমিও মানুষ। কিন্তু সেদিন মনে হচ্ছিল, আমি নিতান্ত একটা অবজ্ঞাত পতিত লোক—নিজের মর্যাদার কোন মূল্য আমার নিজের কাছেই রইল না। দুর্ভাগ্যের বোঝায় হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। যাই হোক, সবই তোমায় বললাম—সাশ্রুনয়নে তোমায় মিনতি করি, এ ঘটনার কথা আর কখনো উল্লেখ কোরো না, কেন না মন আমার ভারি বিষণ্ন, ভারাক্রান্ত, বুক ভেঙে যাচ্ছে।

শ্রদ্ধা রইল ভারেঙ্কা, চিরকাল

তোমার অটুট বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

৩রা সেপ্টেম্বর

আগের চিঠিটা আমি শেষ করতে পারিনি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। লিখতে ভারি কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে কেমন নিঃসঙ্গ থাকতে ইচ্ছে করে আমার, নিঃসঙ্গ আর অসম্ভব বিষণ্ণ। এই রকমের একটা মানসিক অবস্থা আমার ঘন ঘন ফিরে ফিরে আসছে। অতীত স্মৃতির মধ্যে কি যেন একটা আছে যা বোঝাতে পারব না, যা আমাকে অনিবার্যভাবে এমন করে ভাসিয়ে নিয়ে যায় যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সবকিছু ভুলে থাকি। দুঃখেরই হোক, কি সুখেরই হোক ইদানীং এমন একটা অনুভূতি প্রায় হয়ই না যাতে অতীতের এবং সবচেয়ে বেশি করে আমার সোনার ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা মনে না পড়ে। এই রকম মুহূর্তগুলোর পরে কিন্তু আমি সর্বদাই বিমর্ষ হয়ে পড়ি। দুর্বল হতে থাকি, স্বপ্নপ্রবণতায় আমায় নির্জীব করে তোলে, স্বাস্থ্য তো খারাপ হয়েই চলছে।

কিন্তু আজকের সকালটা ভারি তাজা ঝকঝকে ঝরঝরে, শরতে এমন খুব কমই দেখা যায়। আজ বেশ জোর পাচ্ছি, মনটা খুশি। শরৎ এসেছে তাহলে! গাঁয়ের

শরৎকালটাকে কি ভালোই না বাসতাম। তখন আমি বাচ্চা, কিন্তু কি রকম প্রখরভাবে সব অনুভব করতাম। শরতের সকালের চেয়ে সন্ধ্যেগুলোকে আমার বেশি ভালো লাগত। পাহাড়টার কাছে ছিল একটা দীঘির মতো, বাড়ি থেকে অল্প একটু দূরে—এখনো যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। চওড়া, ঝকঝকে, স্ফটিকের একটা মস্ত পাত! সন্ধ্যেটা যদি শান্ত হত, তাহলে দীঘিটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যেত, আশেপাশের গাছ্‌গুলো থেকে এতটুকুও মর্মর উঠত না, আয়নার মতো স্তব্ধ জল। বাতাসটা থাকত ভারি ঠাণ্ডা! তাজা! ঘাসের ডগায় ডগায় জমত শিশির বিন্দু, পারের বাড়িগুলোয় ফুটে ফুটে উঠত আলো, গরুর পাল ফিরত ঘরে। সেই সময় চুপি চুপি পালিয়ে যেতাম আমার দীঘির কাছে, সবকিছু ভুলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, পারের জেলেরা যে সব আগুন জ্বালিয়েছে দূরে জলের ওপর তার ঝলক ছুটে যাচ্ছে লম্বা হয়ে। দেখতাম, তুহিন নীল আকাশ আগুনের ছোপে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। ক্রমে সবকিছু ফ্যাকাশে হয়ে চাঁদ উঠত। আর ভেজা বাতাসে সবকিছু শব্দ ভেসে যেত যেন রুপোর ঘণ্টা-ধ্বনির মতো: ভীতু কোন একটা পাখির পাখার ঝাপট, নলখাগড়ার সামান্যতম কানাকানি,

মাছের একটুখানি ছলাৎ করে ওঠা—সব। তারপর নীল জলের ওপর কুয়াশা জেগে উঠত পাতলা আর স্বচ্ছ, আর দূরের সবকিছু জিনিস আবছা হয়ে যেত অদৃশ্য হয়ে। কিন্তু কাছের জিনিসগুলো সব দেখা যেত পরিষ্কার, যেন খোদাই করা—নৌকাটা, জলের কিনারাটা, চরগুলো; অথবা পারের কাছেই পড়ে থাকা একটা পিপে, কিংবা নলখাগড়ার মধ্যে আটকা পড়া একটা হলদে শাখা। পিছিয়ে পড়া একটা গাংচিল হয়ত ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ডুব দিয়ে ফের উড়ে গেল ঝটপটিয়ে কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম, আর শুনতাম আর কি রকম অদ্ভুত আশ্চর্য লাগত। তখন আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ।...

সত্যি শরৎ ভারি ভালো লাগত আমার, বিশেষ করে হেমন্ত, যখন ফসল কেটে ঘরে তোলা হয়েছে, সব কাজ সারা, গাঁয়ের লোকেরা এর ওর কুটিরে এসে জমায়েত হয়ে কথা কইছে, গান গাইছে, আর অপেক্ষা করছে শীতের। শীতের সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে আসা আকাশের তলায় সবকিছুই হয়ে উঠত বিষণ্ণ, নিরাভরণ। বনভূমির ধারে ঘন হয়ে জমে থাকত শুধু হলুদ পাতা—সে বন ক্রমেই অন্ধকার আর নীলচে হয়ে উঠত, বিশেষ করে সন্ধ্যের দিকে, যখন কুয়াশা নামত, বনের

ভেতরকার গাছ্গুলো দাঁড়িয়ে থাকত দৈত্যের মতো, অতিকায় ভয়ানক এক একটা প্রেতের মতো; মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যেত, বেড়াতে বেড়াতে অন্যদের থেকে কখন পিছিয়ে পড়তাম। হঠাৎ খেয়াল হত যে আমি একলা, তখন ভয় পেয়ে বাড়ি ছুটতাম। পাতার মতো থরথরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভাবতাম, এই বুঝি একটা বিকটাকার মুখ গাছের কোটর থেকে আমার দিকে তাকাবে; হঠাৎ কখন বনের মধ্যে দিয়ে জোরে বয়ে যেত বাতাস, নগ্ন ডালপালা থেকে শেষ পাতাগুলো ঝরিয়ে উড়িয়ে গোঙাত, গর্জন করে উঠত। আকাশ আঁধার করে সকল রবে পাতার ঝড়ের পেছু পেছু ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরত পাখিরা আর এক অবুঝ ভয়ে ভরে উঠত আমার মন, মনে হত যেন ফিসফিস করে কে বলছে, 'পালা, বাছা, দৌড়ে পালা। এখুনি ভারি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এখানটা; পালা, পালা।' আর ভয় পেয়ে আমিও দৌড়তাম একেবারে রুদ্ধশ্বাসে। বহুকষ্টে যখন বাড়ি পৌঁছতাম সেখানে তখন সবকিছুই ভারি খুশি, ভারি গরম। মটর আর কপির খোসা ছাড়ানো কাজ ছিল আমাদের, চুল্লীতে ফট ফট শব্দ করে পুড়ত ভেজা কাঠ, আর সস্নেহে মা চেয়ে চেয়ে দেখতেন, আর বুড়ি ধাই-মা উলিয়ানা আমাদের

সেকালের গল্প বলত নয়ত শোনাত যাদুকর কি প্রেতের কাহিনী। কাছাকাছি ঘন হয়ে আসতাম আমরা, হাসতাম শুনতে শুনতে। তারপর হঠাৎ চুপ করে যেতাম সবাই— কে যেন দরজা ধাক্কা দিল না? কিন্তু না, বুড়ি ফ্রলোভ্‌নার চরকার শব্দ ওটা। তারপর কি কলরোলই না উঠত হাসির! কিন্তু রাত্রে আর ঘুম আসত না দুঃস্বপ্নের ভয়ে। মাঝ রাত্রে চমকে জেগে উঠে নড়াচড়া করতেও সাহস হত না—জেগেই শুয়ে থাকতাম সকাল পর্যন্ত। তবু সকালে উঠতাম একেবারে ফুলের মতো তাজা। জানলার শার্সির মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, মাঠগুলো ইতিমধ্যেই শীতের কবলে পড়েছে, নগ্ন ডালপালায় লেগে আছে শরতের পাতলা তুষার। পাতলা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে ধু ধু করত পুকুর, আর খুশির কাকলী তুলে লাফালাফি করে ফিরত পাখিরা। দীঘির ওপরকার পাতলা বরফ সূর্যের গরমে গলে যেত সহজেই। সে এক ঝকমকে দুনিয়া, সজীব আর সুখী! সামোভার ঘিরে আমরা বসতাম, চুল্লীতে গর্জন উঠত আবার, আর আমাদের কালো কুকুরটা পল্কান—রাত্রের ঠাণ্ডার দরুন তখনো কাঁপত আর জানলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লেজ নাড়ত খুশিতে। জ্বালানি-কাঠের জন্যে বনের দিকে

ঘড়ঘড় করে রওনা দিত হয়ত একটা চাষীদের গাড়ি। সুখের ওই দিনগুলোয় ভারি তৃপ্তি ভারি আনন্দ ছিল আমাদের!... সোনার সেই ছেলেবেলা!...

সে সব কথা মনে পড়লে কাঁদি। অতীতটা কি উজ্জ্বল, আর বর্তমানটা কি কষ্টের, কি অন্ধকার! কবে এর শেষ হবে, হায় ভগবান! জানো, কেমন যেন মনে হয়, এই শরতের মধ্যেই আমায় মরতে হবে। আমি একেবারে নিশ্চয় করে জানি। খুবই অসুস্থ আমি। এ কথা প্রায়ই ভাবি, কিন্তু এখানে মরতে ইচ্ছে করে না আমার, ইচ্ছে করে না এখানকার মাটিতে কবর নিই। হয়ত গত বসন্তে যেমন হয়েছিল, তেমনি ধারা আবার শয্যা নিতে হবে আমাকে। অসুখ থেকে আসলে আমি সেরেই উঠিনি। এই তো এখুনি ভারি শরীর খারাপ করছে আমার। সারা দিন ফেদোরা বাইরে আর আমি একেবারে একা। মাঝে মাঝে একা থাকতে ভয় করে, কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়, যেন ঘরে আরো একজন কে আছে, কেউ যেন আমার সঙ্গে কথা কইছে—এটা হয় বিশেষ করে যখন আমার অতীত স্মৃতি থেকে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠি আর ভয় লাগে আমার। দীর্ঘ চিঠিখানা লিখলাম সেই জন্যেই। লিখতে শুরু করলে ভয় কেটে যায়।

এখন বিদায়। এখানেই শেষ করতে হবে, কেন না আর কাগজ নেই। তাছাড়া সময়ও নেই আর। আমার পোষাক আর টুপিটার দরুন যা পেয়েছিলাম তার আর এক চাঁদি রুবল পরিমাণ বাকি আছে। বাড়িউলীকে তুমি দুই চাঁদি রুবল দিয়েছ জেনে খুশি হয়েছি— কিছু দিন তার এতে চুপ করে থাকা উচিত।

তোমার পোষাক-আষাকটা ঠিক করে নেবার চেষ্টা কোরো। বিদায় বন্ধু, ভারি দুর্বল আমি, এত অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। একটু মেহনত করতে গেলেই হাঁপাই। কাজ যদি বা পাই তাহলেও করব কি করে? এই এক চিন্তাতেই আমার আশা নিভে আসে।

ভ. দ.

৫ই সেপ্টেম্বর

প্রিয় ভারেঙ্কা!

আজ আমার নানা রকম অনুভূতি হয়েছে। যেমন প্রথম কথা, সারা দিন মাথা ধরেছিল। সেটা ছাড়াবার জন্যে ফন্তান্‌কা নদীর পার দিয়ে বেড়িয়ে আসি। সন্ধ্যেটা স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার হয়ে এসেছিল—জানোই তো,

পাঁচটার পরেই অন্ধকার হয়ে যায়। বৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু কুয়াশা যা ছিল তা বৃষ্টির চেয়েও খারাপ। মস্ত মস্ত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে যাচ্ছিল আকাশে। বাঁধের ওপর দিয়ে লোক হাঁটছিল অনেক আর আশ্চর্য, সব লোকের মুখের চেহারাই যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বিমর্ষ। মাতাল চাষীও ছিল তাদের মধ্যে, থ্যাবড়া নাক, খালি মাথা। ছিল টপবুট-পরা ফিনিশ মেয়ে, মজুর, গাড়োয়ান, আমাদের মতো ব্যস্ত কেরানি, একটা রোগা ক্ষয়রোগগ্রস্ত এপ্রেনটিস, পরনে ডোরা-কাটা আলখাল্লা, মুখখানা তেলতেলে কালো, হাতে মস্ত একটা তালা, আর একটা বরখাস্ত সিপাই—অসম্ভব ঢ্যাঙা। হয়ত এই সময়ে এমন ধারা সব লোকই এসে উদয় হয় এখানে। ক্যানেলটাও দেখবার মতো। অতগুলো বাজরা নৌকো ওর মধ্যে আঁটলই বা কেমন করে? সাঁকোর ওপর বসে বসে মেয়েরা মিইয়ে-যাওয়া ভেজা কেক আর পচা আপেল বিক্রি করছিল—নোংরা একদল ভেজা ল্যাপটা মেয়ে। বেড়াতে যাবার পক্ষে ফন্তান্‌কা একটা হতচ্ছাড়া জায়গা। পায়ের নিচে শুধু ভেজা ভেজা পাথর, আর উঁচু-উঁচু, কালো কালো, ধোঁয়া-ভরা বাড়ি। চারিপাশে কুয়াশা, মাথার ওপরে কুয়াশা। কি বিছছিরি অন্ধকার একখান সন্ধ্যে।

গরোখভায়া রাস্তায় যখন ঢুকলাম তখন বেশ অন্ধকার, গ্যাস বাতিগুলো জ্বালানো শুরু হয়ে গেছে। এ রাস্তাটায় অনেকদিন আসিনি। সুযোগ হয়নি। বেশ তাজা লাগল। বড়ো ছোটো নানা রকম সুন্দর সুন্দর দোকান, দামী দামী কাপড় আর ফুল আর ফিতে-বাঁধা টুপিতে ঝলমল করছে, জ্বল জ্বল করছে দোকানের কাঁচ। মনে হবে, ও সব জিনিস বুঝি শুধু সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার জন্যেই। কেউ যে কিনতে পারে তা বৌয়ের জন্যে এ সব জিনিস ভাবাই মুশকিল! বেশ বড়োলোকী রাস্তা। জার্মান রুটিওয়ালারা অনেকেই এখানে বাস করে, তারা বেশ ধনী। কত গাড়ি; রাস্তায় অতগুলো গাড়ি ধরে কি করে! আর কি রকম দামী গাড়িগুলো! ঝকমকে জানলা, সিল্ক আর মখমলে সাজানো, সহিসদের কোমরে তরোয়াল, কাঁধে এপলেট। যত কটা গাড়ি গেল সবকটির ভেতরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ভাবছিলাম, ভেতরে সুসজ্জিত যে মহিলারা বসে আছেন, তাঁরা কাউণ্টেস না কি প্রিন্সেস? সময়টা তখন নিশ্চয় বলনাচ কি সান্ধ্য-পার্টিতে যাবার মতো। কাউণ্টেস কি অন্য কোনো মহীয়সী মহিলার দিকে আরো একটু কাছ থেকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পারলে মন্দ হত না। খুবই সুখের ব্যাপার হত সন্দেহ

নেই। গাড়ির মধ্যে এই রকম উঁকি না দিয়ে তেমন কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি। তোমার কথাও মনে হচ্ছিল আমার, আর মনে হয়ে এত কষ্ট হচ্ছিল, ডার্লিং। এত দুঃখ তোমার কেনই বা হবে, ভারেঙ্কা? আদরের রাণী আমার, অন্যের চেয়ে কিসে তুমি কম? তুমি অতি সহৃদয়া, সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। তাহলে জীবন তোমার এত কষ্টের হল কেন? ভালো মানুষটা কেন অভাব-অবহেলায় দিন কাটাবে অথচ না চাইতেই সুখ এসে হাজির হচ্ছে অন্যের কাছে? অবশ্য, এ কথা জানি ডার্লিং, যে এ রকম করে ভাবা আমার কদাচ উচিত নয় কেন না এর মধ্যে স্বাধীন-চিন্তার গন্ধ লেগে আছে। কিন্তু অকপটে ন্যায্য কথা বলতে হলে, এটা কেন যে মায়ের পেটে থাকতেই ভাগ্য এক জনের ওপর সুপ্রসন্ন অথচ অন্য জন অনাথ হয়ে জন্মেছে বলেই ভাগ্য তার বিরূপ? রূপকথার কাহিনীর মতো মাঝে মাঝে সত্যিই সুখ আসে বোকা ইভানুশ্কার কপালে। ইভানুশ্কা তার দাদুদের সিন্দুক হাতড়িয়ে খাবে দাবে আর ফুর্তি করবে, অন্য দিকে আর একজন হতভাগা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে আর ঠোঁট চাটবে—ওই করতেই যেন সে জন্মেছে! এ রকম করে ভাবা অবিশ্যি

পাপ, কিন্তু জানোই তো, কিছু কিছু পাপ আছে, অজান্তেই যা মনের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়। ঐ রকমের একটা গাড়িতে কেনই বা তুমি চেপে যাবে না, এবং কেনই বা তোমার মিষ্টি হাসির জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে না জেনারেলরা, আমাদের মতো কীটানুকীটেরা নয়? তাহলে তোমার গায়ে উঠত সোনা রুপো — এমন মামুলী জীর্ণ সুতী কাপড়ের ফ্রক পরতে হত না তোমায়। এখনকার মতো এমন রোগা দুর্বল হতে না। তোমার চেহারা হয়ে উঠত গোলাপী তাজা, গোলগাল, মিষ্টি। তোমার ঝকমকে জানলায় উঁকি দিয়ে তোমার ছায়া টুকুন শুধু দেখা আর জেনে নেওয়া যে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে আছ, ওহ্, কি আনন্দেরই না সেটা হত, আমার আদরিণী। অথচ আসলে অবস্থাটা কি? শুধু দুঃখ; কুলোকের চক্রান্তে দুঃখের মধ্যে পড়েছ তুমি, তোমায় জ্বালাতন করে যাচ্ছে ওই গুঁফো অপোগণ্ডটা। যেহেতু ঘুরঘুর করে বেড়াবার মতো বেশ একটি ফ্রক কোট ওনার আছে এবং অপাঙ্গে চেয়ে দেখার মতো আছে একটি সোনার লর্নেট, সেই হেতু ওই হামবড়াটার ধারণা সে যা খুশি তাই করতে পারে, এবং লোকে তার বেয়াড়াপনা কান পেতে শুনবে। কেন শুনবে? কেন? কারণ তুমি অসহায় অনাথিনী,

তোমায় রক্ষা করার মতো ক্ষমতাবান বন্ধু কেউ নেই। অসহায় বালিকার অপমান করতে যে পারে সে কি ধরণের লোক? সে লোক নিতান্তই একটি অপোগণ্ড, মানুষ নয়! শুধু দেখতেই মানুষের মতো। এ আমার দৃঢ় ধারণা। এই ধরণের লোক ওরা! গরোখভায়া রাস্তায় যে অর্গান-বাদকটাকে দেখেছিলাম, মানুষ হিসাবে সেও ওর চেয়ে ভালো। একটা কোপেকের জন্যে সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় ও যদি ঘুরেও মরে তবুও ভালো। ও নিজেই নিজের মনিব, নিজের রোজগারে খায়। ভিখিরি তো আর নয়, লোককে আনন্দ দেবার জন্যে মেশিনের মতো খাটে, যথা শক্তি লোকের ফুর্তি দিচ্ছে। হয়ত ঠিক করে বলতে গেলে ও ভিখিরিই বটে, সত্যিকারের ভিখিরি—কিন্তু যাই বলো, মানী ভিখিরি ও। ক্লান্ত হয়ে গেলেও, ক্ষিদে পেলেও ও নিজের মতো করে কাজ করে চলেছে, কিন্তু কাজ তো করছে। অনেকেই আছে ভারেঙ্কা, যারা নিজের কাজের মূল্য ও পরিমাণ অনুসারে অল্প রোজগার করলেও কারো কাছে মাথা নোয়াবে না, কিছুই চাইবে না। আমি হলাম গিয়ে ঠিক ওই অর্গান-বাদকটির মতো, মানে ঠিক ওর মতো নয়, মানে আদৌ ওর মতো নয়, কিন্তু ভদ্র সম্ভ্রান্ত অর্থে ঠিক ওরই মতো। যথাসাধ্য কাজ

করি আমি! তার বেশি আর কি আমার করার আছে?

অর্গান-বাদকটার কথা মনে হল তার কারণ আমার দারিদ্র্যের কথা আজ আমার যেমন করে মনে হয়েছে এমন আর কখনো হয়নি। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর বাজনা শুনছিলাম। শুনছিলাম নিজেকে একটু অন্যমনস্ক করে রাখার জন্যে, অপ্রীতিকর চিন্তা থেকে সরে থাকার জন্যে। জনকয়েক গাড়োয়ান, একটি যুবতী, এবং বাচ্চা নোংরা একটি মেয়েও শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অর্গান-বাদকটা দাঁড়িয়েছিল কার একটা জানলার নিচে। এর পর নজরে পড়ল প্রায় বছর দশেকের একটি ছেলে— অমন রোগা আর দুবলা না হলে ছেলেটা দেখতে ভালোই হত। গায়ে শুধু একটি শার্ট, প্রায় খালি পা—ছেলেটা হাঁ করে বাজনা শুনছে—বাচ্চা ছেলে তো! ব্যারেল অর্গানের ওপরকার নাচুনী পুতুলটা থেকে চোখ আর ও সরাতে পারে না—অথচ ঠাণ্ডায় হাত পা ওর ঠকঠক করছে, কাঁপছে। শার্টের আস্তিনটা বার বার করে নামাচ্ছে টেনে। দেখলাম হাতে ওর এক টুকরো কাগজও আছে। যে বাক্সটার ওপর ফরাসী মূর্তি এবং মহিলাদের পুতুল নাচ হচ্ছিল সেখানে অবশেষে কে একজন ভদ্রলোক পয়সা ফেললেন। পয়সা পড়ার ঠন্ঠন্ শব্দে ছেলেটা

চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে চারপাশে চাইল। ও বোধ হয় ভেবেছিল, পয়সাটা আমিই দিয়েছি, কেন না ও দৌড়ে আমার কাছে এসে কাঁপা কাঁপা আঙুলে সেই কাগজখানা দিলে, সরু গলায় মিনতি করে বললে, পড়ে দেখতে। কাগজখানা খুলে দেখলাম — সচরাচর যা থাকে তাই — সেই এক মুমূর্ষু মায়ের কথা, তিন ছেলে না খেয়ে আছে, সহৃদয় ভালো মানুষদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন; প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে যে মা মারা গেলে স্বর্গে সাহায্যকারীদের পক্ষে কথা কইবে। ব্যাপারটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়, মামুলী ব্যাপার, কিন্তু আমি ওকে কি দিই? কিছুই যে নেই। এমন দুঃখ লাগল। বেচারী অতটুকু এক বাচ্চা, নীল হয়ে উঠেছে ঠাণ্ডায়! খাওয়াও হয়নি নিশ্চয়। মিথ্যা কথা সে আমায় বলেনি। না, না, মিথ্যা কথা বলা ওর পক্ষে অসম্ভব; সে আমার ভালোই জানা। কিন্তু মুশকিল হল এই যে মায়েরা এমন পাজি যে ছেলেগুলোকে অযত্নে বিনা পোষাকে পাঠাবে রাস্তায়। হয়ত একেবারেই হতাশ হয়ে উঠেছে বোকা মেয়ে — সাহায্য করার মতো কেউ হয়ত নেই, সারা দিন হয়ত বসেই থাকে, হয়ত বা সত্যিই অসুস্থ। তবু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছেই ওর দরখাস্ত করা দরকার

ছিল। তা না করে ঠগ মাগীটা বোধ হয় রোগা উপোসী ছেলেটাকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে পাঠিয়েছে লোক ঠকাবার জন্যে আর ঐ চোথা কাগজ বয়ে বয়ে কি শিক্ষাই না ছেলেটার হচ্ছে। মন ভরে উঠছে ঘেন্নায়। ছুটোছুটি করে ছেলেটা লোকের কাছে গিয়ে মিনতি করছে, কিন্তু ওর কথা শোনার মতো সময়ই নেই কারো। পাথরের হৃদয় ওদের, কথায় একটুও দয়ামায়া নেই: 'পাজী বদমাইসটা কোথাকার! ও সব চালাকি চলবে না!' এ সব কথা শুনে শুনে ঘেন্নায় মন ভরে উঠবে ওর। শীতে কাঁপতে কাঁপতে অসাড় হয়ে উঠবে ছেলেটা, ভীরু একটি পাখির ছানা—বেচারী পড়ে গেছে যেন ভাঙা বাসা থেকে। হাত পা ওর অসাড়, হাড় কাঁপানো বাতাসে ও নিঃশ্বাস নিতেও যেন পারছে না। তারপর কখন অজান্তে কাশি শুরু হবে ওর, সাপের মতো ওর বুকের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে রোগ। তারপর মৃত্যু এসে দাঁড়াবে ওর জন্যে, অপেক্ষা করে থাকবে অন্ধকার ঘুপচি এক কোণে, কেন না ছেলেটাকে যত্ন করা সাহায্য করার মতো কেউ নেই। এই ভাবেই শেষ হবে ওর ছোট্ট জীবনখানা। তা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, ভারেঙ্কা। কেউ যখন বলে, 'খ্রীষ্টের নামে কিছু সাহায্য করুন',

তখন সে কথা শুনে কিছু না দিয়ে শুধু এই কথা বলে চলে যাওয়া 'ভগবান তোমায় সাহায্য করবেন'—সেটা খুব সহজ নয়, ভারেঙ্কা। 'খ্রীষ্টের নামে' কথাটা সবসময়ই অমন দারুণ লাগবে তা অবশ্য নয় (নানা রকমের 'খ্রীষ্টের নামে' আছে, ডার্লিং)। ভিখিরিরা যেমন করে বলে তেমনি করে যান্ত্রিকভাবে ঘ্যানর ঘ্যানর করে কথাটা বলা চলে। এ রকম কাউকে কিছু না দিলেও তেমন অস্বস্তি হয় না। সে পুরনো পেশাদার ভিখিরি। এ সব সয়ে সয়ে শক্ত হয়ে গেছে। যে করেই হোক চালিয়ে যাবার মতো লোক সে। কিন্তু মাঝে মাঝে 'খ্রীষ্টের নামে' কথাটা শোনায় ভারি অদ্ভুত, আর ভাঙা ভাঙা, আর ভয়ঙ্কর। এমনি শুনিয়েছিল আজকে। ছেলেটার কাগজখানা যখন পড়ছি তখন ঠিক বেড়ার কাছটা থেকে কে একজন বলে উঠল, 'খ্রীষ্টের নামে একটা পয়সা দেবেন, বাবু!' লোকটা ভিক্ষে করছিল না, এমনিই দাঁড়িয়েছিল ওখানে। গলার স্বরটা এমন ভাঙা ভাঙা যে আমি চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু কি দেব আমি। কিছুই নেই আমার। অথচ ভেবে দ্যাখো, গরিবেরা তাদের দুর্ভাগ্যের কথা শোনাতে গেলে বড়োলোকদের কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে বলে কিনা কি জঞ্জাল, কি স্পর্ধা! দারিদ্র্য জঞ্জালই বটে।

উপোসী লোকেদের কাতরানিতে কি ওদের রাত্রের ঘুমে ব্যাঘাত হয় কখনো ?

সত্যি কথা বলতে ডার্লিং, আমি এ সব লিখছি খানিকটা বুক হালকা করে নেবার জন্যে এবং খানিকটা আমার রচনার উন্নত স্টাইলের নমুনা তোমায় দেখাবার জন্যে। দেখতে পাচ্ছ, সম্প্রতি আমার স্টাইল গড়ে উঠছে। এবং এই মুহূর্তে আমি এতই বিষণ্ন যে নিজের চিন্তার প্রতি সহানুভূতি পোষণ না করে পারছি না। যদিও এ কথা জানি ডার্লিং, যে এ রকম সহানুভূতিতে কোথাও গিয়ে পেঁাছব না, তবু নিজের প্রতি সুবিচার করতে মন্দ লাগে না। বিশেষ করে এই কারণে যে লোকে প্রায়ই নিজেকে দীন বলে ভাবে, নিজেকে একেবারে নগণ্য করে রাখতে চায়, এক কুচি কাঠের চেয়েও নিচু মনে করে নিজেকে। একটা তুলনা দিয়ে বলি, যে বাচ্চা ছেলেটা আমার কাছে ভিক্ষে চেয়েছিল আমি তো ঠিক তারই মতো ভীত ও বিপর্যস্ত। একটু রূপক দিয়ে বলছি বলে ক্ষমা করো ভারেঙ্কা, সাতসকালে আপিস যাওয়ার সময় আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি, শহরটা কি করে জেগে উঠে ধোঁয়া ছাড়ছে, টগবগ করছে, শব্দ তুলছে। আর তাতে ভারি ক্ষুদ্র মনে হয়

নিজেকে, মনে হয় যেন কেউ বুঝি নাকের ওপর এক থাপ্পড় মেরেছে। এ রকম হলেই কুঁকড়ে গিয়ে ইঁদুরের মতো নিরীহভাবে চলে যাই। কিন্তু এখন একবার দেখা যাক ওই সব বড়ো বড়ো অন্ধকার ঝুলকালি মাখা একঘেয়ে বাড়িগুলোর মধ্যে কি হচ্ছে। একবার তাকিয়ে দেখে ভেবে দেখা যাক নিজেকে অত নিচু আর অপ্রস্তুত ভাবার কারণ সত্যিই আছে কি না। ভেবো না ভারেঙ্কা, এ সব আমি প্রত্যক্ষ অর্থে বলছি, বলছি রূপক হিসাবে। তাহলে ঐ সব বাড়িগুলোর ভেতরে কি দেখতে পাব আমরা? দেখা যাবে, স্যাঁতসেঁতে ঘরে কুকুর-কুঠরীর মতো এক অন্ধকার কোণে, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে কামরা, সেখানে জেগে উঠছে একটি মজুর। খুব সম্ভব সারা রাত ধরে সে এক জোড়া জুতোর স্বপ্ন দেখেছে— আগের এই জুতো জোড়া সে অনিচ্ছায় নষ্ট করে ফেলেছে। এ রকম বাজে স্বপ্নও অবিশ্যি লোকের দেখা দরকার। কিন্তু মজুরটা হল গে একজন মুচি, সুতরাং অনবরত জুতোর বিষয়ে সে যদি চিন্তা করে তবে সেটা মার্জনীয়। ওর ছেলেমেয়েগুলো ঘ্যানর ঘ্যানর করছে, ক্ষিদেয় মরছে বৌটা। শুধু মুচিরাই যে এ রকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে জাগে তা কিন্তু নয়। অবিশ্যি এ রকম স্বপ্ন সে

দেখছে কিনা তাতে কিছু এসে যায় না, এবং এ ব্যাপারটা উল্লেখ করারও যোগ্য হত না যদি আর একটি ঘটনা না থাকত, যথা, ঐ বাড়িতেই ওপর তলায় থাকেন একজন খুব বড়োলোক, তিনিও তাঁর সোনার মহলে শুয়ে শুয়ে সারা রাত ধরে জুতোর স্বপ্ন দেখেছেন, মানে ঠিক ঐ একই জুতো জোড়া নয়, অন্য ফ্যাশনের — তবু জুতোরই স্বপ্ন, এবং এই অর্থে ডার্লিং, আমরা সকলেই হলাম খানিকটা মুচির মতো। এতেও অবশ্য কিছু এসে যেত না, কিন্তু মুশকিল হল এই যে কাছাকাছি এমন কেউ নেই যে ঐ অতি ধনী ব্যক্তিটির কানে কানে বলে যে এ জিনিস নিয়ে ভাবা, শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা এবং নিজের জন্যেই বাঁচা তার উচিত নয়। সে তো আর মুচি নয়, ছেলেপিলেগুলোও তার নীরোগ, বৌও খিদেয় মরছে না! চারপাশে একবার তাকিয়ে সে দেখুক না কেন জুতোর চিন্তার চেয়ে উন্নত কিছুতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার মতো কিছু পাওয়া যাচ্ছে কি না। রূপকভাবে এই কথাটিই তোমায় বলতে চাইছি। হতে পারে যে এটা একটা স্বাধীন চিন্তা, কিন্তু ভারেঙ্কা, এ চিন্তাটা মাঝে মাঝে মনে উদয় হচ্ছে আমার, এবং উদয় হলেই বাক্যস্রোতে হৃদয় থেকে তা নির্গত হতে থাকে। সুতরাং

নিজেকে দীন করে রাখা এবং শহরের হুল্লোড় আর গর্জন দেখে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। পরিশেষে এ কথা জানাই, ডার্লিং; তুমি হয়ত ভাবছ আমি নেহাৎ গাল গল্প ছড়াচ্ছি, কিংবা মেজাজটা আমার ভালো নেই, নয়ত কোনো বই থেকে এ সব কথা আমি টুকে দিয়েছি। না ভারেঙ্কা, তোমায় নিশ্চিন্ত করে জানাই, যে গাল গল্প ছড়ানো আমি সব চেয়ে ঘেন্না করি, মেজাজ আমার খারাপ নয়, এবং কিছুই আমি অন্য কোথাও থেকে টুকে দিইনি। এই হল ব্যাপার!

বাড়ি ফিরেছিলাম বিষণ্ন মেজাজে; কেটলি ফুটিয়ে এক কাপ চা তৈরি করার আয়োজন করছি, এমন সময় আমার সেই গরিব প্রতিবেশী গর্‌শ্‌কোভ এসে হাজির হল হঠাৎ। সকাল বেলায় লক্ষ্য করেছিলাম ও আমার কাছে এবং অন্যান্য ভাড়াটেদের কাছে ঘেঁসবার চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি ডার্লিং, যে ওর অবস্থা আমার চেয়ে শতগুণ খারাপ—বৌ ছেলেপুলে সব নিয়ে খারাপ না হয়ে উপায় কি? আমি যদি গর্‌শ্‌কোভ হতাম, তাহলে সত্যিই কি করব বুঝে পেতাম না। যাই হোক, গর্‌শ্‌কোভ তো এসে ঘরে ঢুকল, মাথা নুইয়ে নমস্কার করলে, চোখ দিয়ে যেমন হলুদ জল গড়ায় তেমনি

গড়াচ্ছে ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উশখুশ করতে লাগল, কথা কইতে পারছিল না। আমি একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম— চেয়ারটা ভাঙা, ও ছাড়া আর চেয়ার নেই—আর কিছু চা দিলাম খেতে। অনেকক্ষণ ধরে ও না-না করলে, তারপর শেষে গেলাসটা নিলে। কিন্তু চিনি নিতে চাইলে না। যখন তাকে চিনি নেবার জন্যে জিদ করলাম, ও অনেকক্ষণ ধরে নানা রকম যুক্তি দিয়ে না-না করে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে ছোটো এক টুকরো চিনি নিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করে বললে যে চা'টা নাকি আশ্চর্য রকমের মিষ্টি। উঃ, দারিদ্র্যে মানুষকে কি রকম দীন করে ফেলে দেখেছ। জিগ্যেস করলাম, 'কি রকম চলছে, বন্ধু?' ধন্যবাদ দিয়ে ও বলতে শুরু করলে, 'মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, আপনি আমার হিতৈষী, আপনি কি আমায় ঈশ্বরের করুণার নামে একটি গরিব পরিবারকে সাহায্য করতে পারেন না! আমার বৌ আর ছেলেগুলো, জানেন তো। কিছুই খাবার নেই ওদের। আর বাপ হয়ে আমি অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি!' আমি কথা বলতে যাব, ও ফের বাধা দিয়ে বলে চলল, 'এখানকার সকলকে বড়ো ভয় করে আমার, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, মানে ভয় ঠিক নয়, লজ্জা করে কিছু

বলতে। ওরা সবাই এমন ডাঁট নিয়ে থাকে, এত পরপর। আপনি আমার বন্ধু এবং উপকারী, আপনাকে ফের বিরক্ত করতে আসতাম না। জানি আপনার নিজেরই নানা সমস্যা; আমায় বেশি কিছু সাহায্য করতে পারবেন না, তবু দয়া করে কিছু ধার দিন। এর জন্যে আপনার দ্বারস্থ হওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না; কিন্তু জানি আপনি বড়ো দয়ালু, আমার মতোই আপনি অভাবী, এখন কষ্টে পড়েছেন, তাই আমার দুরবস্থা আপনি বেশি বুঝবেন।' এই বলে সে তার স্পর্ধা এবং অভদ্রতার জন্যে বার বার করে মাফ চাইলে। আমি বললাম, ওকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম কিন্তু আমার কাছে কিছু নেই, একেবারেই কিছু নেই। ও ফের অনুনয় করে বললে, 'মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, আমি বেশি চাইছি না, কিন্তু অবস্থা হল.... (বলতে গিয়ে ও লাল হয়ে উঠল) আমার বৌ আর ছেলেগুলোকে, জানেন তো। ওরা না খেয়ে আছে। মাত্র দশ কোপেক যদি দেন...' এত খারাপ লাগল। সত্যি লোকটার হাল আমার চেয়েও খারাপ। তখন আমার কাছে ছিলই মাত্র সর্বসাকুল্যে কুড়ি কোপেক। কালকের জরুরী খরচ চালাবার জন্যে ওইটুকুই আমার ভরসা। বললাম, 'না, সত্যি উপায়

নেই।' কেন নেই বুঝিয়ে বললাম। 'কিন্তু মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, যা বলতে হয় বলুন, যা করতে হয় করুন—কিন্তু অন্তত দশ কোপেক আমায় দিন!' আমার কুড়ি কোপেকি সিক্কাটা বাক্স থেকে নিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম। কুড়ি কোপেকও কি না দান, ভারেঙ্কা! কি দারিদ্র্য! আমরা আলাপ করতে লাগলাম এবং পরিশেষে ওকে জিগ্যেস করলাম, এই রকম অবস্থা সত্ত্বেও ও পাঁচ রুবল দিয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে কি করে? ও বললে, এসেছিল ছ' মাস আগে, তখন তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে দিয়েছিল। তারপর অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। আশা করেছিল, ইতিমধ্যে ওর সেই দুর্ভাগা মামলাটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সরকারি টাকা ফাঁকি দেবার অভিযোগে ও একজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। ব্যাপারটা ধরা পড়ায় পাজিটার বিচার হয় এবং তাতে সে গর্শ্কোভকেও জড়িয়ে ফেলে। আসল ঘটনা হল গর্শ্কোভের যে ত্রুটি সেটা হল মাত্র তৎপরতার অভাব, নজর ফসকে যাবার ত্রুটি, রাষ্ট্রের স্বার্থ অবহেলার অপরাধ। বছরের পর বছর মামলাটা চলেছে, কিন্তু একটার পর একটা বাধা হচ্ছে গর্শ্কোভের। গর্শ্কোভ বলে, 'যে অসম্মান

আমার ওপর চাপানো হয়েছে, তার কোনো দোষ আমার নেই। আমি একান্তই নির্দোষ! চুরি এবং জালিয়াতি আমি মোটেই করিনি।' কিন্তু মামলা হওয়ার ফলে ওর মান-সম্মান চলে গেল। চাকরি খতম হয়ে গেল, এবং যদিও দোষী প্রমাণিত সে হয়নি, তবু পুরো খালাসও সে পাচ্ছে না। পুরোপুরি খালাস হয়ে গেলে ওই ব্যবসায়ীটির কাছ থেকে মোটা রকম টাকা ওর প্রাপ্য হবে—গর্‌শ্‌কোভের কথা আমি বিশ্বাস করতে রাজী, কিন্তু আদালত বিশ্বাস করছে না। ব্যাপারটা ভারি জটিল, এত জট পাকানো যে একশ বছরেও সে জট খুলবে না। একটা জট খোলসা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ীটি আর একটি গেরো উদ্ভাবন করে বসে। গর্‌শ্‌কোভের জন্যে দুঃখ হয়, ওর জন্যে খুব একটা সহানুভূতি অনুভব করি। কাজ নেই ওর। ওর সুনাম গেছে বলে কাজ কেউ দেবেও না। যা কিছু ছিল, বহুদিন সব বিক্রি হয়ে গেছে। মামলা চলেছে তো চলেইছে, ইতিমধ্যে কুক্ষণে ছেলে হল একটি; এ সবে টাকার দরকার। ছেলেটা অসুখে পড়ল তো ফের টাকার দরকার। তারপর যখন মরল, তখনও দরকার হল টাকার। বৌ অসুস্থ, ওর নিজেরও একটা পুরনো রোগ আছে। মোটের ওপর, লোকটা ভারি ভুগেছে। ও ভাবছে অবশ্য, যে

দু'চার দিনের মধ্যে একটা অনুকূল রায় হয়ে যাবে, তাতে নাকি কোনো সন্দেহই নেই। লোকটার জন্যে ভারি কষ্ট হয়, ভারেঙ্কা। যথাসাধ্য ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। লোকটা একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে, সাহায্য ওর বড়োই দরকার। যথাসাধ্য আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম। বিদায় ডার্লিং, খ্রীষ্ট তোমার সঙ্গে থাকুন, কুশলে রাখুন তোমায়। ভারেঙ্কা, আদরের ভারেঙ্কা আমার, তোমার কথা ভাবলেও বুকটা জুড়োয় আর তোমার জন্যে কষ্ট সওয়া সে তো একটা তৃপ্তি।

তোমার অকৃত্রিম বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

৯ই সেপ্টেম্বর

স্নেহের ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না।

আমার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়: দারুণ একটা ব্যাপার ঘটেছে। মাথা ঘুরছে, সবকিছুই ঘুরছে। কি হয়েছে তুমি ধারণা করতে পারবে না। এ রকম ব্যাপার আমরা কল্পনাও করিনি। কিন্তু না, তা কল্পনায় ছিল না বলে এখন বিশ্বাসও হতে চাইছে না, কল্পনা করেছি,

মনের মধ্যে এই রকমই কিছু একটা ছিল। সেদিন এই রকমেরই কিছু একটা স্বপ্নও দেখেছি।

ঘটনাটা এই। কোন্ রকম স্টাইল না করেই তার বিবরণ দিচ্ছি—যা মনে আসছে তাই। আজ সকালে যথারীতি আপিসে গিয়ে ডেস্কের পাশে আমার জায়গাটিতে বসে লিখতে শুরু করেছিলাম। এখানে বলে রাখা দরকার ডার্লিং, যে গতকালও আমি এই-ই করেছিলাম, এবং তিমফেই ইভানভিচ্ স্বয়ং এসে বলেছিলেন, তার একটা দরকারি নথি অবিলম্বে নকল করে দিতে হবে, 'দয়া করে এটিকে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে নকল করে দিন তো', উনি বলেছিলেন, 'হুজুর আজ এটায় স্বাক্ষর দেবেন।' বলতেই হবে ডার্লিং, যে গতকাল আমি ঠিক স্বাভাবিক ছিলাম না। ভারি নিঃসঙ্গ এবং বিমর্ষ লাগছিল। হৃদয় ভরে উঠেছিল দুশ্চিন্তায়। মনের মধ্যে অন্ধকার। ভারি ভাবনা হচ্ছিল তোমার জন্যে। যাই হোক কাজ করতে শুরু করলাম—দলিলখানা সুন্দর এবং সঠিক করে নকল করে দিলাম। কিন্তু শয়তানের কারসাজিই বলো, কি বিধাতার নির্বন্ধই বলো, কিংবা হয়ত যা ঘটেছে তা হতেই বাধ্য—যাই বলো, একটা লাইন আমার বাদ পড়ে গিয়েছিল। তাতে করে, ঈশ্বর জানেন, যদি

কিছু মানে করতে হয় সে একেবারে অসম্ভব। কাগজখানা হুজুরের কাছে নিয়ে যেতে ওদের দেরি হয়েছিল, হুজুর সেটা আজকে সই করলেন। এ সব কিছু না জেনে আমি আপিসে এসে এমেলিয়ান ইভানভিচের পাশটিতে তো গিয়ে বসেছি। এখানে আরো একটা কথা বলে নেওয়া দরকার, ডার্লিং—গত কিছুদিন থেকে আমার লজ্জা সঙ্কোচ একটু বেশি বেড়ে গিয়েছিল। কারো মুখের দিকে তাকাতে চাইতাম না। চেয়ারের একটুখানি ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ হলেও চমকে উঠতাম। আজকেও প্রায় মড়ার মতো, নিজের মধ্যে গুটিয়ে বসে আছি যেন একটা কাছিম—এফিম আকীমভিচ্ (লোকটার মতো অত রগুড়ে দুনিয়ায় আর নেই) সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'মাকার আলেক্সেয়েভিচ্ অমন... ইয়ের মতো বসে আছ কেন হে', এই বলে সে এমন একখান মুখভঙ্গি করলে যে সকলে হো হো করে হেসে উঠল। ওরা অবিশ্যি এই নিয়ে পেয়ে বসল। কিন্তু আমি চোখ কান বুজে ভাণ করতে লাগলাম যে কিছুই আমার কানে যাচ্ছে না, কিছুই চোখে পড়ছে না। আমাকে যাতে ওরা ছেড়ে দেয়, তার জন্যে এই পন্থাই সবচেয়ে ভালো। এমন সময় শুনি একটা সোরগোল উঠল, আমার নামও শোনা

গেল কয়েকবার। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে আমারই ডাক পড়েছে, দেভুশ্‌কিনেরই ডাক পড়েছে। বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল—অত যে ভয় পেলাম কেন কে জানে, জীবনে অমন ভয় কখনো লাগেনি। একেবারে অসাড় হয়ে বসে রইলাম চেয়ারে, নড়াচড়া পর্যন্ত নেই, আমার যেন ডাকই পড়েনি। সোরগোলটা কাছে আসতে আসতে একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। 'দেভুশ্‌কিন! দেভুশ্‌কিন! কই কোথায় দেভুশ্‌কিন?' মুখ তুলে চাইলাম। দেখি এভ্‌স্তাফি ইভানভিচ্‌ সামনে দাঁড়িয়ে। বলছে, 'হুজুর তোমায় ডাকছেন। দলিলখানা তুমি নষ্ট করে ফেলেছ।' ওই যেটুকু বললে তাতেই একেবারে হয়ে যাবার কথা, তাই না? সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে প্রায় মূর্ছা যাই আর কি। কি করে যে উঠে হেঁটে গিয়েছিলাম জানি না। কি যে তখন ভাবছিলাম তাও এখন বলা অসম্ভব। শুধু এইটুকু মনে আছে যে আমরা প্রথমে একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে গেলাম, তারপর আর একটা এবং তারপর তৃতীয় ঘরের মধ্যে দিয়ে খাস কামরায় একেবারে মুখোমুখি! হুজুর এবং আর সবাই সেখানে হাজির! ভয়ে এমন কি অভিবাদন করতেও মনে ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করছে ঠোঁট আর ঠক ঠক করছে পা। অবশ্য তার কারণ

ছিল, ডার্লিং: কেন না প্রথমত ডান দিকের আয়নাটায় আমার চোখ পড়েছিল এবং সেখানে যা দেখেছিলাম, তাতে একটা লোকের একেবারে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কথা। এবং দ্বিতীয়ত, আমি চিরকালই এমন ভাবে চলে এসেছি যেন আমি বলে কেউ নেই, কিন্তু এখন আমি আদৌ আছি এটা হুজুর জানলেন কি করে? হয়ত দেভুশ্‌কিনের নাম দপ্তরে কাউকে বলতে শুনেছেন, কিন্তু দেভুশ্‌কিনকে তার চেয়ে বেশি জানার কোনো ইচ্ছে তাঁর তো হয়নি।

সক্রোধে উনি বললেন, 'কী ব্যাপার। এত অসাবধান কেন আপনি? জরুরী দলিল—একেবারে নষ্ট করে দিয়েছেন!' হুজুর তারপর এভ্‌স্তাফি ইভানভিচের দিকে ফিরে তাকালেন। যা বলছিলেন তার টুকরো টুকরো কিছু কথা কানে আসছিল, 'এ রকম অবহেলা ... ফের ঝামেলা ...' বার কয়েক চেষ্টা করলাম মুখ খুলতে, ক্ষমা চাইতে, কিন্তু একটা শব্দও বেরুল না। পালাতে পারলে বাঁচতাম, কিন্তু সাহস হল না। তারপর যা নয় তাই ঘটল, এমন ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড যে লিখতে গিয়েও লজ্জায় কলম কেঁপে যাচ্ছে। কোটের ওপর একটা বোতাম, শালা বোতামটা লেগেছিল শুধু একটুখানি সুতোয়। বোতামটা

হঠাৎ খসে গিয়ে টুংটাং করে লাফাতে লাফাতে গিয়ে হাজির হল একেবারে হুজুরের পায়ের কাছে। আর চারিদিকে সবাই তখন একেবারে চুপ করে আছে! ক্ষমা চাইবার বদলে কি না ঐ বোতামটা! হুজুরের কাছে জবাবদিহি হল কি না এই করে! এর ফলাফল এতই ভয়াবহ যে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। হুজুর আমার দিকে চেয়ে আমার পোষাক-আষাক আর চেহারা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। আয়নায় কি দেখেছিলাম তা ভুলিনি, নিচু হয়ে বোতামটা কুড়িয়ে নিতে গেলাম। কি যে পেয়ে বসেছিল আমায়। বোতামটা ধরতে গেলাম, কিন্তু সেটা গড়াতেই লাগল সুতরাং বুঝতেই পারছ, বেশ একটা কৃতিত্ব দেখালাম। মনে হল আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেতে শুরু করেছে।

সর্বস্ব গেল আমার: আমার মান-মর্যাদা সবকিছু একেবারে চিরকালের মতো গেল। মাথার মধ্যে এমন ভোঁ ভোঁ করছিল যে কেমন করে যেন মনে হল ফালদোনি আর তেরেসার চেঁচামেচি হল্লা শুনছি, হাজার কণ্ঠে একই সঙ্গে কারা যেন কথা কইছে। শেষ পর্যন্ত বোতামটার নাগাল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে শক্ত হয়ে রইলাম। দু'পাশে দুই হাত রেখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই আমার উচিত ছিল।

কিন্তু কোথায়! নাড়াচাড়া করতে লাগলাম বোতামটা নিয়ে, ছেঁড়া সুতোর মধ্যে ওটাকে গোঁজার চেষ্টা করতে লাগলাম এমন ভাবে যেন ওটা ফের ওখানে লেগে থাকবে। আর সারা সময়টা আমি রইলাম হাসিহাসি মুখ করে, সত্যি, নিতান্ত হাসিহাসি মুখে। হুজুর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর আমার দিকে ফের একবার তাকিয়ে এভ্স্তাফি ইভানভিচ্‌কে বললেন, 'কি ব্যাপার! লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? কি হয়েছে ওর? হায় সর্বনাশ!' বললে কি না 'কি হয়েছে ওর?' তোফা একখান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি বটে, তাই না? এভ্স্তাফি ইভানভিচ্ বললে, 'কাজের রেকর্ড ওর নিখুঁত, চমৎকার কণ্ডাক্‌ট্, নির্ধারিত হারেই বেতন পায়...' হুজুর বললেন, 'তা হলে, যা করে হোক একটু সাহায্য করুন ওকে, কিছু একটা অগ্রিম দিয়ে দিন না...' 'কিন্তু ওর যা পাওনা সবই সে আগেই নিয়ে নিয়েছে। অবস্থার ফেরে পড়েই করেছে বোধ হয় কেন না ওর কণ্ডাক্‌ট্ চমৎকার, রেকর্ড নিখুঁত, একেবারে নিখুঁত! ওর বিরুদ্ধে একদম কিছু নেই।' নরকের আগুনে আমি তখন পুড়ছি ডার্লিং, মরছি। শুনতে পাচ্ছিলাম হুজুর বললেন, 'বটে, বটে। কাগজখানা তাহলে আর একবার তাড়াতাড়ি নকল করে দিক। দেভুশ্‌কিন, এখানে

আসুন। কাগজখানা নকল করে দেবেন, ভুল যেন না থাকে। আর শুনুন...' হুজুর এই বলে অন্য সকলকে নানা হুকুম দিয়ে চলে যেতে বললেন, আমরা রইলাম একা। পকেট থেকে টাকার ব্যাগ বার করে উনি একশ রুবলের একখানা ব্যাঙ্ক নোট আমার হাতে গুঁজে দিলেন, 'নিন... ইচ্ছে মতো যা খুশি ভেবে নিন। আপনাকে কিছু সাহায্য করতে চাই।' চমকে উঠলাম ভারেঙ্কা, একেবারে অবাক হয়ে গেলাম, কি যে হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ওঁর হাতখানা চুম্বন করা উচিত ছিল আমার কিন্তু উনি লাল হয়ে উঠেন—আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, ভারেঙ্কা—লাল হয়ে উঠেন, সত্যি সত্যি আমার অপদার্থ হাতখানা হাতে নিয়ে এমন ভাবে হ্যাণ্ড-শেক করলেন যেন আমিও এক জেনারেল। বললেন, 'এখন আসুন। আপনার জন্যে আরো বেশি কিছু করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। ফের যেন ভুল করবেন না। যা হয়েছে তার দোষটা আমরা ভাগ করে নেব।'

ফেদোরা আর তোমার কাছে আমি এবার একটি অনুরোধ করতে চাই, ভারেঙ্কা: হুজুরের মঙ্গলকামনা করে রোজ প্রার্থনা কোরো। আমার ছেলেপিলে থাকলে

তাদেরও বলতাম, বাপের জন্যে যা প্রার্থনা করা উচিত, তার চেয়েও বেশি করে হুজুরের জন্যে প্রার্থনা করতে। এ কথাও বলব, আমার আদরের ভারেঙ্কা, আমি একেবারে সত্যি করেই বলছি—যতই সহ্য করে থাকি না কেন আমাদের চরম অভাবের দিনে আর তোমার বিপদ-আপদে সাহায্য করতে পারার অক্ষমতায় নিজেকে যতই দীন বলে গণ্য করে থাকি না কেন, তা সত্ত্বেও, শপথ করে বলব, যে এই একশ রুবলটায় তত না, হুজুর যে আমায় হ্যাণ্ড-শেক করেছেন, এই কাগতাড়ুয়া মাতালটার হাতখানা নিজের হাতে নিয়েছেন, এই ঘটনাটাই আমার কাছে অত্যন্ত দামী। উনি আমায় ফের মানুষ করে দিয়েছেন, ভারেঙ্কা। আমার মনটাকে পুনরুজ্জীবিত করে উনি চিরকালের জন্যে আমার জীবন মধুময় করে দিয়েছেন। যত পাপই আমি করি না কেন হুজুরের মঙ্গলের জন্যে আমি যে প্রার্থনা করব, জানি তা ভগবান শুনবেনই।

ভারি বিচলিত হয়ে পড়েছি ভারেঙ্কা, একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে আছি। বুকের মধ্যে ভয়ানক ঢিপ ঢিপ করছে আর যেন ভারি দুর্বল লাগছে। ব্যাঙ্ক নোটে পঁয়তাল্লিশ রুবল তোমায় পাঠালাম। কুড়ি রুবল দেব

বাড়িউলীকে, ফলে থাকবে আর পঁয়ত্রিশ রুবল। পোষাক-আষাক মেরামত করে নেবার জন্যে লাগবে কুড়ি রুবল। অন্যান্য খরচের জন্য তাহলে থাকল পনেরো। সকালবেলাকার এই সব অনুভূতিতে আমি একেবারে বেসামাল হয়ে গেছি। শুয়ে থাকাই আমার দরকার। কিন্তু তবু বেশ প্রকৃতিস্থ আমি, মনটা শান্ত। শুধু ব্যথা করছে যেন প্রাণের ভেতরটা, অনেক গভীরে সে প্রাণ সচকিত হয়ে কাঁপছে তা যেন টের পাচ্ছি। পরে দেখা করব তোমার সঙ্গে। এই মুহূর্তে এত সব কাণ্ডের পর মাথা ঘুরছে। ভগবান সবই দেখছেন, ডার্লিং, সোনামণি লক্ষ্মীটি আমার!

তোমার বন্ধু,

মাকার দেভুশ্কিন

১০ই সেপ্টেম্বর

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

তোমার সৌভাগ্যের কথা শুনে খুবই আনন্দ হল, তোমাদের বড়ো কর্তার দয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

দুর্ভাবনা থেকে এখন তুমি একটু শান্তি পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই টাকাটা উড়িয়ে দিয়ো না। নির্ঝঞ্ঝাটে এবং যথাসাধ্য সাদাসিধা ভাবে থাকার চেষ্টা কোরো, আর রোজ একটু করে সঞ্চয় করে রাখতে শুরু কোরো, তাহলে বিপদের সময় অসুবিধা হবে না। আমাদের জন্যে ভেবো না। ফেদোরা আর আমি কোনো রকমে চালিয়ে নেব। অত টাকা আমাদের জন্যে তুমি কেন পাঠিয়েছ, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্? সত্যিই অত দরকার নেই আমাদের— যা আছে তাতেই আমরা খুশি। অন্য বাসায় উঠে যেতে হলে অবশ্য সত্যি টাকার দরকার, কিন্তু পুরনো একটা ধারের দরুন কিছু টাকা পাওয়া যাবে বলে ফেদোরা আশা করছে। হঠাৎ দরকার যদি পড়ে সেজন্যে কুড়ি রুবল রেখে বাকিটা তোমায় ফেরত পাঠালাম। পয়সাকড়ি সাবধানে রেখো, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। বিদায়। দুর্ভাবনার শান্তি হোক তোমার। কুশলে থেকো, মন ভালো থাক। ভারি ক্লান্ত লাগছে নইলে আরো লিখতাম। কাল বিছানাতেই শুয়ে ছিলাম। দেখা করতে আসবে শুনে ভারি ভালো লাগল। সত্যি এসো।

ভ. দ.

১১ই সেপ্টেম্বর

ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না, লক্ষ্মীটি আমার!

আমার এখন এত সুখ, এত তৃপ্তি, এখন তুমি চলে যেয়ো না। ফেদোরার কথা শুনো না, লক্ষ্মীটি, যা চাইবে তোমার জন্যে সব করব। ঠিক মতো চলব আমি, তা সে শুধু হুজুরকে মান্য করবার জন্যে হলেও। ফের আমরা আগের মতো পরস্পরকে সুখের চিঠি দেব, একের সুখ, এবং দুঃখ থাকলে দুঃখ ভাগ করে নেব। সুখে শান্তিতে বাস করব আমরা। ফের আমরা সাহিত্যে মন দেব। জীবন আমার ভালোর দিকে চলেছে, ভারেঙ্কা। বাড়িউলী সদয় হয়ে উঠেছে। তেরেসার বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে এমন কি ফালদোনিও কথা শুনছে। রাতাজ্যায়েভের সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছি। আনন্দে আমি নিজেই যেচে ওর কাছে গিয়েছিলাম। ভেতরে ভেতরে ও ভারি ভালোমানুষ ডার্লিং, লোকে ওর সম্পর্কে যত কুকথা রটিয়েছে সব বাজে। এখন বুঝেছি এ সব একেবারে অপবাদ। আমাদের নিয়ে বই লেখার কথা ও কখনো ভাবেইনি। নিজেই আমাকে ও সে কথা বললে এবং নতুন লেখা থেকে কিছু কিছু পড়েও শোনালে। আর আমাকে লাভ্‌লেস নাম

দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পর্কে বুঝিয়ে বললে, যে কথাটা অশ্লীল বা গালাগালি কিছু নয়—বিদেশী ভাষা থেকে ধার নেওয়া একটা শব্দ ওটা ; তার মানে 'চালাক লোক'। অর্থাৎ সাধু এবং বইয়ের ভাষায় বলতে গেলে শব্দটার অর্থ, 'ত্বরিৎ-বুদ্ধি ভদ্রযুবা।' এই হল ব্যাপার। সুতরাং ওটা একটা নির্মল রহস্য মাত্র, নেহাৎ অগা আমি তাই ভুল বুঝেছিলাম। ওর কাছ থেকে মার্জনা চেয়ে নিয়েছি আমি... তাছাড়া দিনটাও আজকে ভারি সুন্দর। বৃষ্টি পড়েছিল বটে এবং সকালে একটু হালকা তুষারপাতও হয়েছে, কিন্তু তাতে বরং বাতাসটা তাজাই হয়ে উঠেছে। জুতো কিনতে গিয়েছিলাম আর সুন্দর এক জোড়া জুতো কিনেছি আমি। নেভ্স্কি প্রস্পেক্টে বেড়াতে গিয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'প্চেলা'* কাগজখানাও পড়েছি। ওহো, আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গেছি।

শোনো: আজ সকালে এমেলিয়ান ইভানভিচ্ এবং আক্সেন্তি মিখাইলোভিচের সঙ্গে হুজুর সম্পর্কে আলাপ হচ্ছিল। দেখলাম, শুধু আমাকেই যে উনি দয়া করেছেন তা নয়। শুধু আমারই হিতৈষী তিনি নন। সহৃদয়তার

---

* 'সেভের্নায়া প্চেলা' (উত্তরাঞ্চলী মক্ষিকা)—একটি সংবাদপত্র।

জন্যে হুজুরের নাম আছে, অনেকেই ওঁর প্রশংসা করেন, অনেকেই ওঁর জন্যে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছেন। শুনলাম, উনি নাকি একটি অনাথিনীকে পালন করেছিলেন তারপর বেশ একটি পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেন— লোকটা কেরানি, হুজুরের বিশেষ বিশেষ কাজ করত। বিধবার একটি পুত্রের জন্যেও তিনি একবার একটি চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন এবং এ ছাড়াও আরো অনেক সৎকাজ করেছেন। এই সব সংবাদের সঙ্গে আরো কিছুটা সংবাদ যোগ করা আমার কর্তব্য বলে মনে করে ওদের কাছে আমার গল্পটা শুনিয়েছিলাম। কিছুই ঢেকে রাখিনি। লজ্জার যেটুকু তা শিরোধার্য করেই নিয়েছিলাম—তাছাড়া এ অবস্থায় লজ্জা কিসের। হুজুরের ভালো কাজের প্রশংসা সকলে শুনুক। বেশ উৎসাহ করে আমি বলেছিলাম, বলতে বলতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম—লজ্জায় লাল হবার বদলে বরং আমার গর্বই হচ্ছিল যে এ রকম ঘটনা আমি বলতে পারছি। ওদের বললাম সবকিছুই (তোমার কথা তাই বলে কিছুই বলিনি কিন্তু)। বাড়িউলী আর ফালদোনি, আর রাতাজ্যায়েভ আর জুতো আর মার্কভ, মোটের ওপর সবকিছু সম্পর্কেই ওদের বললাম। কেউ কেউ হাসল। বরং বলা যায় সকলেই হেসে উঠল। হয়ত

আমার চেহারা বা আমার জুতো জোড়া সম্পর্কে হাস্যকর কিছু একটা ছিল। ও হ্যাঁ, এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি ওটা আমার জুতোর জন্যেই। ওরা অবশ্য খারাপ কিছু ভেবে করেনি। হেসেছিল, তার কারণ শুধু এই যে ওদের বয়স অল্প আর অবস্থা ভালো। মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো বিদ্বেষ ছিল না ওদের। নইলে হুজুরের কথায় কি করে ওদের হাসি পাওয়া সম্ভব? তাই কি পারে, না কি বলো, ভারেঙ্কা?

এখনো অভিভূত হয়ে আছি, ডার্লিং। ঘটনাগুলো আমায় ভারি বিচলিত করেছে। তোমাদের জ্বালানি-কাঠ বেশ আছে তো? শরীরের যত্ন নিয়ো ভারেঙ্কা, দেখো যেন ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। লক্ষ্মীটি আমার, তোমার মন খারাপ দেখলে ভারি কষ্ট লাগে। ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করি তোমার জন্যে। উলের মোজা আর গরম জামা তোমার আছে তো? বুড়ো মানুষটাকে একটু করুণা করে বোলো, কি তোমার দরকার। শুধু একটু বোলো। দুঃসময় তো কেটে গেল, আমায় নিয়ে ভেবো না, সামনেই সুদিন!

ভারি খারাপ সময় এসেছিল আমাদের ভারেঙ্কা, কিন্তু সে সব এখন গত! পরে হয়ত এই সব দিনের কথা মনে করেও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে আমাদের। আমার

অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে। এমন দিনও গেছে যখন নিজের কাছে একটি কোপেকও নেই, গরম পোষাক নেই, খাবার নেই তবু সুখী ছিলাম। সে সব দিনে সকালে যদি নেভ্‌স্কিতে একটি সুন্দর মুখ চোখে পড়ত, তাহলে তাতেই আমার সারা দিন সুখে কেটে যেতে পারত। সে এক কাল গেছে! বেঁচে থাকাটা সত্যিই সুন্দর ভারেঙ্কা, বিশেষ করে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। কাল আমি সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা করেছি ঈশ্বরের কাছে, আমাদের দুরবস্থার ঐ দিনগুলিতে যে সব পাপ করেছি তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি—অভিযোগ যা জানিয়েছি, স্বাধীন চিন্তা যা কিছু করেছি, অনাচার যা ঘটেছে, তার জন্যে। প্রার্থনার মধ্যে সস্নেহে ভেবেছি তোমার কথা। তুমিই তো আমাকে বাঁচিয়েছ, সান্ত্বনা দিয়েছ, সুপরামর্শ শুনিয়েছ। এ কথা আমি কখনো ভুলব না, ডার্লিং। আজ একটি একটি করে তোমার সবকটি চিঠিতে চুমু খেয়েছি। বিদায় আমার ভারেঙ্কা। শুনেছি, কাছেই কোথায় একটা আপিসের কোট নিলাম হচ্ছে। খোঁজ করে দেখব নাকি? বিদায়, আমার আদরের রাণী, বিদায়!

তোমার স্নেহময়,

মাকার দেভুশ্‌কিন

১৫ই সেপ্টেম্বর

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

মন অত্যন্ত বিচলিত। কপালে কি যে আছে জানি না। ঘটনাটা বললেই তুমি বুঝবে। শ্রীযুক্ত বীকভ সেণ্ট পিটার্সবুর্গেই আছেন। ফেদোরার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। দ্রজ্‌কি গাড়ি চেপে যাচ্ছিলেন, ফেদোরাকে দেখে নেমে আসেন এবং তার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করেন সে কোথায় আছে। ফেদোরা বলতে অস্বীকার করে। তখন উনি একটু হেসে বলেন যে কে ওর সঙ্গে থাকে তা উনি ভালোই জানেন (নিশ্চয়ই আন্না ফিওদরভ্না বলে দিয়েছেন)। ফেদোরা তখন আর নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে ওকে বেশ একচোট শুনিয়ে দিয়েছে, বলছে উনি চরিত্রহীন, আমার সব দুঃখের উনিই কারণ। জবাবে উনি বলেন, দুঃখ আমার হবেই, কেন না আমার এক কোপেকও সম্পদ নেই। ফেদোরা তখন তাঁকে বলে যে আমি অন্তত কাজ কর্ম করে জীবন চালিয়ে নিতে পারতাম, কিংবা কাউকে বিয়ে করতে পারতাম, নয়ত একটা চাকরি-বাকরিও হতে পারত, কিন্তু সুখ আমার চিরকালের জন্যে গেছে, এখন অসুখে মরতে চলেছি। তাতে উনি বলেন,

যে আমি একটু বেশি ছেলেমানুষ এবং অবাধ্য, তাছাড়া আমার সতীত্বেরও কিছুটা হানি ঘটেছে (একেবারে হুবহু এই বলেছেন উনি)। ফেদোরা আর আমার ধারণা ছিল, কোথায় আছি তা উনি জানেন না, কিন্তু গতকাল গস্তিনি দ্‌ভোরে কিছু কেনা কাটার জন্যে যেই একটু বেরিয়েছি, অমনি আমাদের ঘরে এসে উনি হাজির হন। আমি যখন বাড়ি নেই ঠিক সেই সময়। এ ওঁর ইচ্ছে করেই আসা বলে মনে হয়। তিনি তারপর আমার সম্পর্কে এবং আমাদের জীবন সম্পর্কে ফেদোরাকে নানা প্রশ্ন করেন, সবকিছু খুঁটিয়ে নজর করেন, আমাদের হাতের কাজগুলো পর্যন্ত। তারপর জিগ্যেস করেন; যে কেরানিটির সঙ্গে আমাদের আলাপ সেটি কে? ঠিক তখনই তুমি আঙিনা পার হয়ে যাচ্ছিলে, ফেদোরা তোমাকে দেখিয়ে দেয়। উনি তাকিয়ে ফের একটু হাসেন। ফেদোরা ওঁকে চলে যেতে বলে। বলে যে নানা হাঙ্গামায় আমি অসুস্থ, ওঁকে দেখলে আমার ভারি অসহ্য লাগবে। এ কথার জবাব না দিয়ে উনি বলেন, বিশেষ কিছু করার নেই বলে এমনিই এসেছেন। ওকে পঁচিশ রুবল দিতে চান, ও অবিশ্যি নেয়নি। কিন্তু এ সবের মানে কি? এলেন কেন? আমাদের সম্পর্কে সব খবর উনি টের পেলেন

কি করে? ভেবে কূল পাচ্ছি না। ফেদোরা বলছে, ওর ননদ আক্সিনিয়া মাঝে মাঝে আমাদের দেখতে আসে, তার সঙ্গে ধোপানী নাস্তাসিয়ার আলাপ আছে, এবং আন্না ফিওদরভ্‌নার ভাইপোর বন্ধু যে দপ্তরে কাজ করে সেখানেই নাস্তাসিয়ার খুড়তুতো ভাই হল গে দরোয়ান। নিশ্চয়ই এই সূত্রেই আন্না ফিওদরভ্‌না সব আঁচ করেছেন। ফেদোরার অবশ্য ভুলও হতে পারে। কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। ফের যদি আসে? ভাবতেই আতঙ্ক হচ্ছে। কাল যখন ফেদোরা এই সব বলছিল, আমার তখন প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা। আমার কাছ থেকে আর কি চান উনি! ওঁর সঙ্গে আর দেখা করতে আমি রাজী নই। হতভাগিনী এক মেয়ের পেছু লেগে থাকার কি কারণ ওঁর? সারাক্ষণ আমি আতঙ্কে মরছি। বীকভ যদি এক্ষুণি এসে পড়ে? কি আছে আমার কপালে? এক্ষুণি এসে দেখা কোরো, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, ভগবানের দোহাই, এক্ষুণি চলে এসো।

ভ. দ.

১৮ই সেপ্টেম্বর

ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না!

আজ আমাদের বাড়িতে একটা অপ্রত্যাশিত করুণ এবং খুবই দুর্বোধ্য ব্যাপার ঘটেছে। বেচারা গর্‌শ্‌কোভ পুরোপুরি খালাস পেয়েছে। সিদ্ধান্তটা আগেই হয়েছিল, আজ সে গিয়েছিল চূড়ান্ত রায় শুনতে। মামলাটা ওর পক্ষেই নিষ্পত্তি হয়েছে। কাজে অবহেলার দরুন তার যা দোষ তা মাফ করা হয়েছে। ব্যবসায়ীটির কাছ থেকে সে বেশ মোটা একটা টাকা পেয়েছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে, সুতরাং ওর অবস্থা ফিরল, মান-মর্যাদার পুনরুদ্ধার হল। মোটের ওপর, সব কিছুরই সুরাহা হল: ও যতটা আশা করেছিল সবই পেল। বিকেল তিনটের সময় ও ফিরে আসে একেবারে যেন প্রেতের মতো বিবর্ণ, থরথর করছে ঠোঁট দুটো, কিন্তু তবু হেসেই যাচ্ছে। বৌ আর ছেলেপিলেগুলোকে ও আলিঙ্গন করলে, দল বেঁধে আমরা গেলাম ওকে অভিনন্দন জানাতে। ভারি অভিভূত হয়ে ও অভিবাদন করে গেল অনবরত, আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বারবার করে হ্যাণ্ড-শেক করলে। মনে হল কেমন যেন ওকে লম্বা দেখাচ্ছে, পিঠটা সিধে হয়ে এসেছে, চোখের কোণে অনবরত যে জল ঝরত সেটা নেই। বেচারার

কি উত্তেজনা! এক মিনিটের জন্যেও স্থির হয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, অনবরত এটা সেটা তুলছে আবার রাখছে, অনবরত হাসছে আর অভিবাদন করছে, একবার বসছে ফের উঠে দাঁড়াচ্ছে, আর কি যে বলছে ভগবান জানেন: 'আমার মর্যাদা, সুনাম, ছেলেপুলে আমার...' কাঁদতেও শুরু করেছিল ও। আমাদের সকলের চোখেও জল এসেছিল। বোধ হয় ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে রাতাজ্যায়েভ বললে, 'খাবার না থাকলে মান-মর্যাদার আর দাম কি বন্ধু। আসল কথা টাকা। সেইজন্যেই বরং ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।' এই বলে সে ওর পিঠ চাপড়ে দিলে। আমার মনে হয় যেন তাতে গর্‌শ্‌কোভ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। সরাসরি সে অবিশ্যি তার বিরক্তি প্রকাশ করেনি, কিন্তু রাতাজ্যায়েভের দিকে ভারি অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে কাঁধ থেকে তার হাতখানা ও নামিয়ে দিলে। এ রকম কাজ আগে কখনো তার দ্বারা সম্ভব হত না। নানা লোকের নানা চরিত্র। যেমন, এমন আনন্দের দিনে আমি কখনো অতটা গর্ব করতে পারতাম না। এক একটা সময় আসে যখন মানুষ বেশি করেই দুটো বাড়তি সেলাম জানায়, নিজেকে অতি বিনীত করে রাখতে চায় শুধু এই জন্যেই যে তার মনটা কোমলতা আর শুভেচ্ছায়

ভরে উঠেছে। কিন্তু নিজের কথা থাক। গর্‌শ্‌কোভ বললে, 'হ্যাঁ, টাকাটাও ভালো জিনিস, ভগবানকে সেজন্যে ধন্যবাদ।' বারবারই শুধু ওর এই এক কথা, 'ভগবানকে ধন্যবাদ!' ওর বউ বেশ একটা ভালো রকম খাবার বায়না দিলে। নিজেই রান্না করলে বাড়িউলী, বাড়িউলীরও এক রকমের দয়ামায়া আছে। দুপুরের খাবার শুরু না হওয়া পর্যন্ত গর্‌শ্‌কোভ খুব ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। লোকে ডাকুক না ডাকুক, সবকটি ঘরে ঘরে ও যেতে শুরু করলে। ঘরে ঢুকে ও কেবল একটু হাসছিল বসছিল, হয়ত কিছু একটা বলছিল, হয়ত তাও বলছিল না, তারপর উঠে চলে যাচ্ছিল। নৌবাহিনীর অফিসারের ঘরে ওকে চার নম্বরের খেড়ু করে এক হাত তাস খেলবার জন্যে নেমন্তন্ন এল। ফলে ও খেলাটি একেবারে পণ্ড করে দিলে, তিন চারটে বিদঘুটে দান দিয়ে চলে যাবার সময় বললে, 'ভেবেছিলাম এই দু'এক দান খেলে যাই একটু।' বারান্দায় আমার সঙ্গে দেখা হতেই আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকাল কেমন অদ্ভুতভাবে তারপর ফের আমার হাতে চাপ দিয়ে চলে গেল হাসিমুখে, কিন্তু সে হাসিখানা কেমন অদ্ভুত, যেন জোর করা কিছুটা প্রাণহীন হাসি। আনন্দে কাঁদছিল ওর বৌ, ওদের ঘরখানায় সবকিছুর মধ্যেই একটা উৎসবের আমেজ।

দুপুরের খাবারের পরে ও বৌকে বললে, 'একটু শুই।' শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ ও ছোট মেয়েটিকে ডেকে তার মাথাটায় চাপড় দিতে লাগল। তারপর বৌয়ের দিকে ফিরে জিগ্যেস করলে, 'আমাদের পেতেঙ্কা কোথায় গো?' বৌ তৎক্ষণাৎ ক্রুশ করে ওকে স্মরণ করিয়ে দিল যে পেতেঙ্কা মারা গেছে। ও বললে, 'ও হ্যাঁ। পেতেঙ্কা তো স্বর্গে আছে।' বৌ টের পেয়েছিল যে লোকটা কেমন প্রকৃতিস্থ নয়—ঘটনাটায় ও একেবারে বেসামাল হয়ে গেছে। বললে, 'ঘুমিয়ে নাও একটু।' 'হ্যাঁ... একটু ঘুমব।' এই বলে ও পাশ ফিরে শুল তারপর মাথাটা ফেরালে এমন ভাবে যেন কিছু বলবে। বৌ বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলে, 'কিছু বলছ?' কিন্তু ও জবাব দিলে না। ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে বৌ বাড়িউলীর সঙ্গে দেখা করতে গেল এবং ঘণ্টা খানেক সেখানে ছিল। ফিরে এসে দেখে ও তখনো ঘুমচ্ছে। বৌ তখন এটা ওটা কিছু কাজ করতে শুরু করে। আধ ঘণ্টা খানেক ও এমনি কাজ করেছে নিজের মনে, গর্‌শ্‌কোভের কথা কিছু মনে হয়নি। কিন্তু তারপর কেমন যেন একটা আতঙ্কে ও চমকে উঠেছিল। কেমন মড়ার মতো একটা স্তব্ধতা ঘরখানায়। বিছানার দিকে তাকিয়ে ওর চোখে

পড়ল, গর্শ্কোভ সেই একই ভাবেই শুয়ে আছে। কাছে এসে কম্বল তুলে দেখা গেল গর্শ্কোভ বরফের মতো ঠাণ্ডা, মারা গেছে—বজ্রাহতের মতো মারা গেছে গর্শ্কোভ, কেন কে জানে। আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি, এখনো ঠিক সামলে উঠতে পারছি না। এ কেমন ধারা মরণ? কি একখান জীবন ওর, বেচারী গর্শ্কোভের, কি এক জীবন! ওর বউ কাঁদছিল আতঙ্কে, ছোটো মেয়েটা সরে গিয়ে লুকোল একটা কোণে। তারপর খুব একটা সোরগোল উঠল। শুনেছি পোস্টমর্টেম তদন্ত হবে। কিন্তু সঠিক বলতে পারি না। এত খারাপ লাগছে যে বলার নয়। কখন যে মানুষের শেষ আসে কে জানে... আজ আছে কাল নেই...

তোমার

মাকার দেভুশ্কিন

১৯শে সেপ্টেম্বর

ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না!

তোমাকে জানাই যে রাতাজ্যায়েভ আমার জন্যে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে জনৈক লেখকের কাছে। রাতাজ্যায়েভের কাছে লেখকটি এসেছিল একটা ভারি

মোটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে — ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মোটা রকমেরই কাজ। দুর্ভাগ্যবশত লোকটার হাতের লেখা এত অপরিষ্কার যে কি করে সামলাব জানি না। তাড়াতাড়ি দরকার, কিন্তু এমন অদ্ভুতভাবে লেখা যে পড়ে বোঝা যায় না... ঠিক হয়েছে এক এক পাতার জন্যে চল্লিশ কোপেক করে দেবে। এই খবরটা তোমায় এই জন্যে জানাচ্ছি যে এর ফলে আমি কিছু বাড়তি টাকা রোজগার করতে পারব। বিদায় আমার ডার্লিং, এখন কাজে বসে যেতে হবে।

তোমার চিরন্তন বন্ধু,

মাকার দেভুশ্‌কিন

২৩শে সেপ্টেম্বর

মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, প্রিয় বন্ধু আমার!

গত তিন দিন তোমায় কিছু লিখিনি। এ তিন দিন আমার ভারি বিপদ আর দুশ্চিন্তায় কেটেছে।

গত পরশু বীকভ ফের আমার কাছে এসেছিলেন। আমি একলা ছিলাম, ফেদোরা কোথায় যেন বেরিয়েছিল। দরজা খুলে ওঁকে দেখেই এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে প্রায় নড়ার শক্তি ছিল না। খুব বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম

নিশ্চয়। উনি ঘরে ঢুকলেন ঠিক সেই চিরাচরিত উচ্চ হাসির সঙ্গে, তারপর একটা চেয়ার টেনে বসলেন। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে আমি অবশেষে কোণে বসে কাজ করতে লাগলাম। আমার চেহারা দেখে বোধ হয় ওঁর হাসি মিলিয়ে এসেছিল। ইদানীং আমি ভারি রোগা হয়ে গিয়েছি। চোখ মুখ বসে গেছে আমার, বোধ হয় কাগজের মতো ফ্যাকাশেও হয়ে গিয়ে থাকব... এক বছর আগে যারা আমায় জানত এখন বোধ হয় আমায় দেখে তাদের চেনা কষ্ট হবে। কিছুক্ষণ উনি আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে তারপর ফের খুশি হয়ে উঠলেন। কি যেন বললেন। কি জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই, উনি ফের হেসে উঠলেন। পুরো এক ঘণ্টা উনি এখানে বসে বসে কথা কইলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। যাবার সময় আমার হাতটা নিয়ে বললেন (হুবহু তিনি যা বলেছিলেন), 'এ শুধু তোমায় বলছি, ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না, আমার পরিচিতা এবং তোমার এই আত্মীয় আন্না ফিওদরভ্‌নাটি হল একটি জঘন্য মেয়েমানুষ।' এই বলে উনি একটা খারাপ কথা যোগ করলেন। 'উনি তোমার পিসতুতো বোন সাশাকে গোল্লায় পাঠিয়েছেন এবং তোমারও সর্বনাশ করেছেন। আর আমার কথা যদি বলো, আমি

অবশ্য একটা পাষণ্ডের মতো ব্যবহার করেছি, কিন্তু এ দোষ সব পুরুষেরই আছে।' এই বলে উচ্চ স্বরে উনি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, কথা উনি তেমন ভালো বলতে পারেন না। তবে মূল কথাটা—তাঁর আত্মসম্মানের দরুন যে কথাটা তাঁর বলা দরকার সে কথাটা তিনি বলেছেন, এখন বাকিটুকু তিনি সংক্ষেপে জানাতে চান। এবং ঐ মুহূর্তেই তিনি জানালেন, যে তিনি আমার পানিপ্রার্থী, আমার সম্মান পুনরুদ্ধার করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন, তিনি ধনী, বিয়ের পর তিনি আমায় নিয়ে যাবেন স্তেপ অঞ্চলে তাঁর গাঁয়ে, সেখানে খরগোশ শিকার করা তাঁর সখ। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তিনি আর কখনো ফিরবেন না, কেন না এটা ভারি বিছছিরি শহর। শহরে তাঁর এক অপদার্থ ভাইপো আছে, তাকে তিনি এক পয়সাও সম্পত্তি দিয়ে যেতে চান না, সেই জন্যেই বিয়ে করতে চান: চান প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। এই হল তাঁর বিয়ের প্রধান কারণ। অতঃপর, আমি খুব খারাপভাবে বাস করছি এই মন্তব্য করে বললেন যে এ রকম একটা অন্ধকূপে বাস করলে আমায় রুগ্ন দেখাবে তাতে আশ্চর্য কি? আর এক মাস এখানে থাকলে আমার মরণ যে নিশ্চিত সে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করলেন।

বললেন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বাসস্থানগুলো ভারি বিছ্ছিরি এবং জানতে চাইলেন, আমার কি কি দরকার।

তাঁর প্রস্তাবে ভয়ানক বিচলিত হয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। কেন যে কাঁদলাম জানি না। আমার চোখের জলটাকে উনি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বলে ধরে নিয়ে জানালেন, আমি যে একজন দরদী, অনুভূতিপ্রবণা এবং শিক্ষিতা মেয়ে তা তিনি চিরকালই জানতেন, তবু উপযুক্ত খোঁজ তল্লাশ না করে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তিনি তারপর তোমার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলেন। বললেন যে উনি সব শুনেছেন, তুমি নীতিপরায়ণ লোক, উনিও তাঁর দিক থেকে, তোমার কাছে কোনো ঋণ রেখে যেতে চান না। সুতরাং তুমি আমার জন্যে যা কিছু করেছ তার বদলে পাঁচশ রুবল যথেষ্ট হবে কি না। আমি বললাম তুমি যা করেছ, তা দাম দিয়ে শোধ করা যায় না। তাতে উনি ধমক দিয়ে বললেন, যত বাজে কথা; নিতান্ত নভেলীপণা। বললেন আমি একান্তই ছেলেমানুষ, সম্ভবত কবিতা পড়ার বাতিক আছে। নভেল আর কবিতা থেকেই যত অল্পবয়সী মেয়েরা নষ্ট হয়। বই-জিনিসটাই সাধারণভাবে দুর্নীতি ছড়ায়, বই তিনি মোটেই দেখতে পারেন না। ওঁর মতো বয়স হলে আমিও বুঝতে পারতাম কোন লোক

কি রকম। বয়স না হলে মানবচরিত্র সম্পর্কে ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। তারপর আমায় বললেন, ওঁর প্রস্তাবটা যেন আমি ভালো করে বিবেচনা করে দেখি—হট্‌পট্‌ করে এমন একটা জিনিসে সায় দিলে পরে অনুশোচনা হতে পারে। হট্‌পট্‌ করে না ভেবেচিন্তে কিছু একটা করে বসেই অল্পবয়সীরা সর্বনাশ ডেকে আনে। আমি যে হাঁ বলব সে কথা শুনতে তিনি অবশ্য উদ্‌গ্রীব। অন্যথায় মস্কোর জনৈক ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করতে তিনি বাধ্য হবেন, কেন না ঐ হারামজাদা ভাইপোটাকে সম্পত্তি দেবেন না বলে তিনি শপথ নিয়েছেন। আমার আপত্তি সত্ত্বেও এম্ব্রয়ডারি ফ্রেমের ওপর তিনি পঁচিশ রুবল রেখে গেছেন। টাকাটা, তাঁর কথা অনুসারে, কিছু মিষ্টি খাবার জন্যে। বললেন, গ্রামাঞ্চলে গেলে আমি দেশের সেরা সেরা খাদ্য খেয়ে থাকব এবং বন্‌ রুটির মতো গোলগাল হয়ে যাব। উপস্থিত তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ত, সারা দিন ধরে ছুটোছুটি করেছেন। সময় করে আমার ঘরে ঘুরে গেলেন। এই বলে তিনি বিদায় নিলেন। এই সব নিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ভেবে অবশেষে মন ঠিক করে ফেলেছি। লোকটাকে আমি বিয়ে করব। ওর প্রস্তাব গ্রহণ করাই উচিত। আমার কলঙ্ক থেকে কেউ

যদি আমায় উদ্ধার করতে পারে, আমার সুনাম ফিরিয়ে দিয়ে দুঃখ-কষ্ট দারিদ্র্যের হাত থেকে কেউ যদি আমায় বাঁচাতে পারে, তবে উনিই পারবেন। ভবিষ্যতের কাছ থেকে আশা করার মতো আমার আর কি আছে, আর কি চাইবার আছে ভাগ্যের কাছে। ফেদোরা বলছে, সুখের সুযোগ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় এবং একে যদি সুখ না বলো তবে আর কাকে বলবে? নিজের দিক থেকে আমি আর কোনো উপায় দেখছি না, বন্ধু। কি করব? এত খাটতে হচ্ছে যে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। সবসময় কাজ করতে পারি না। আর তার পরিণাম সে তো ঐ একটা গাভার্নেস কি চাকরানী হওয়া? তা আমার সহ্য হবে না আমি ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরব, তাছাড়া কারো সঙ্গে আমার পোষাবেও না। স্বভাবতই আমি রুগ্ন, কারো না কারো ওপর বোঝা হয়েই থাকতে হবে। জানি, যেখানে যাচ্ছি সেটা কিছু স্বর্গধাম নয়, কিন্তু তাছাড়া করবই বা কি? বলো, কি আমি করব? কি পথ আছে আমার?

পরামর্শ আমি অবশ্য সত্যিই চাইছি না। নিজেই ভেবে ঠিক করেছি। যে সিদ্ধান্তের কথা তোমায় লিখলাম, সেটার বদল হবে না। বীকভ তাগিদ দিচ্ছেন, ওঁকে

জানিয়ে দেব। উনি বলছেন, ওঁর কাজকর্মের তাড়া আছে, আমার কিছু খেয়ালের জন্যে বিয়েটা পেছিয়ে দিতে উনি রাজী নন। সুখী হব কি হব না, ভগবানই জানেন, তাঁরই দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছায় আমার ভাগ্য সঁপে দিলাম। লোকে বলে বীকভ দয়ালু লোক। আমায় ও সম্মান দেখাবে, আমিও হয়ত ওঁকে শ্রদ্ধা করতে শিখব। এ রকম বিয়ে থেকে তার বেশি কি আশা করা সম্ভব?

যা বলবার সব তোমায় বললাম, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, জানি, আমার কি কষ্ট তা তুমি বুঝবে। আমায় ফেরাতে চেয়ো না। পারবে না! কি কি কারণে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম তা একবার নিজে বিচার করে দেখো। প্রথমটা খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু এখন একটু শান্ত হয়ে এসেছি। পরে কি হবে কে জানে। ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। যা হয় হবে, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।...

এইমাত্র বীকভ এলেন, চিঠি শেষ না করেই উঠতে হচ্ছে, যদিও অনেক কথা বলার ছিল। বীকভ ঘরেই রয়েছেন!

ভ়. দ.

২৩শে সেপ্টেম্বর

ভার্‌ভারা আলেক্সেয়েভ্‌না আমার!

তাড়াতাড়ি করে তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসেছি এবং ঘোষণা করছি যে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে... গতকাল আমরা গর্‌শ্‌কোভকে কবর দিয়ে এলাম। তা ঠিক ভারেঙ্কা, বীকভ উদার-হৃদয়ের মতো আচরণ করেছেন, কিন্তু সত্যিই কি তুমি সম্মতি দিয়ে দিয়েছ, ডার্লিং? ভগবানের হাতেই অবশ্য সবকিছু, এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য; এটাও নিশ্চয় ভগবানের হাত। স্রষ্টার বিধান ভাগ্যের বিধানের মতো দুর্জ্ঞেয় হলেও তা পবিত্র। সে বিষয়ে কোনো কথাই উঠতে পারে না! ফেদোরাও জিনিসটা ভালো বলছে। এবার অবশ্য তুমি সুখী হবে ডার্লিং, সুন্দরী রাণী আমার, চোখের মণি আমার, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন, ভারেঙ্কা?... অবিশ্যি হ্যাঁ, বীকভের কাজকর্ম পড়ে আছে। সকলেরই কাজকর্ম আছে বৈকি, হয়ত ওঁকেই কাজকর্ম দেখাশুনা করতে হবে... উনি যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিলেন, তখন ওঁকে দেখলাম। বেশ সুপুরুষ চেহারা। সুপুরুষেরও বেশি। কিন্তু কোথাও

কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। উনি সুপুরুষ কি না সেটা কথা নয়, আসলে আমি বড়ো বিচলিত হয়ে পড়েছি। এবার থেকে আমরা পরস্পরকে চিঠি লিখব তাহলে কেমন করে? আমিই বা কি করে একলা থাকব। তুমি যা বলেছিলে সেইভাবে তোমার সবগুলি যুক্তি আমি মনে মনে বিচার করে দেখছি; সারাক্ষণ বসে বসে শুধু বিচার করে দেখছি। ওই পাণ্ডুলিপিটার বিশ পাতাটা নকল করছিলাম এমন সময় খবরটা পেলাম। তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছ, নানা রকম জিনিস কেনা এখন তোমার দরকার: ফ্রক, জুতো ইত্যাদি। গরোখভায়াতে একটা দোকান আমার জানা আছে। দোকানটা সম্পর্কে তোমায় আগেও বলেছিলাম, মনে আছে? কিন্তু এখন কি করে ছেড়ে যাওয়া তোমার সম্ভব? সে কি কথা! এখন যাওয়া তোমার চলতে পারে না, অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব! কতো কি জিনিস কিনতে হবে, গাড়িও কিনতে হবে একটা। তাছাড়া আবহাওয়াটা বিছছিরি। কি রকম বৃষ্টি পড়ছে দেখেছ, একেবারে ধারাবর্ষণ। একেবারে ভেজা চব্‌চবে! তাছাড়া ... তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। তোমার হার্টে ঠাণ্ডা জমে যাবে! অচেনা লোককে তুমি ভয় করো, তবু চলে যাবে। তাহলে আমার কি রইল? ফেদোরা

বলেছে তোমার কপাল খুব ভালো ... কিন্তু ফেদোরা হল গে একটা বদমাইস মাগী, শুধু আমার সর্বনাশ করাই ওর লক্ষ্য। সান্ধ্য উপাসনায় আসবে তো? তোমাকে একবার দেখবার জন্যে আমিও যাব। সত্যি কথা ডার্লিং, অতি সত্যি কথা যে তুমি বিদূষী, গুণবতী এবং অনুভূতিপ্রবণা মেয়ে। কিন্তু ব্যবসায়ীর মেয়েটিকে বিয়ে করলেই উনি ভালো করতেন! তাই না, ভারেঙ্কা? ব্যবসায়ীর মেয়েটিকে বিয়ে করলেই কি ভালো হত না? সন্ধ্যের পরে ঘণ্টা খানেকের জন্যে তোমার কাছে যাব। আজকাল তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়, আমি ঠিক যাব। অন্ধকার হয়ে এলেই ঠিক যাব। এখন তুমি বীকভের জন্যে অপেক্ষা করছ। উনি চলে গেলে আমি যাব... সবুর করো ডার্লিং, আমি যাচ্ছি...

মাকার দেভুশ্‌কিন

২৭শে সেপ্টেম্বর

প্রিয় বন্ধু, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্!

শ্রীযুক্ত বীকভ বলছেন, ওলন্দাজ কাপড়ের তিন ডজন শেমিজ আমার দরকার। দর্জি মেয়ে জোগাড় করতে হবে, যারা দু'ডজন সেলাই করে দিতে পারবে; সময়

এত কম। শ্রীযুক্ত বীকভ অধৈর্য হয়ে উঠছেন। বলছেন, এই সব নটঘটির ব্যাপারগুলো ভারি ঝামেলার। বিয়ে হতে আর পাঁচ দিন। পরদিনই আমরা চলে যাব। বীকভের ভীষণ তাড়া, এত সময় নষ্ট করাটা ওর কাছে লজ্জার। আমি এত ছুটোছুটি করেছি যে দাঁড়িয়ে থাকারও শক্তি আর নেই। এক গাদা কাজ বাকি আছে, না করতে হলে বাঁচতাম। আর একটা কথা: আমাদের কাছে ব্লন্দ বা লেস বেশি নেই, কেনারও লোক নেই। শ্রীযুক্ত বীকভ বলছেন, তিনি চান না যে তাঁর স্ত্রীকে চাকরানীর মতো দেখাক, ওঁর ভাষায়, স্থানীয় মহিলাদের তিনি চোখ-ছানাবড়া করে দিতে চান। গরোখভায়া রাস্তায় মাদাম শিফোনের কাছে গিয়ে তুমি একটু বলবে, মেয়ে দর্জি পাঠিয়ে দিতে, অথবা দয়া করে উনি নিজেই যেন আসেন। শরীরটা আজ আমার ভালো নেই। আমাদের নতুন বাসাটা ভারি ঠাণ্ডা আর ভারি অগোছালো। বীকভের যে খুড়ি এখানে আছেন, তিনি এতই বুড়ি এবং অসুস্থ যে ভয় হচ্ছে আমরা চলে যাবার আগেই তিনি না মারা যান। বীকভ বলছেন, ও কিছু নয়, উনি ঠিক ভালো হয়ে যাবেন। এখানে সবকিছুই এমন এলোমেলো। বীকভ এখানে থাকেন না, চাকরবাকরগুলো অনবরত ছুটোছুটি করছে কোথায় কে জানে। মাঝে মাঝে কাজ করবার।

জন্যে পাওয়া যায় শুধু ফেদোরাকে। বীকভের খানসামার ওপরেই এখানকার ভার—তিন দিন ধরে ওর পাত্তা নেই। বীকভ আসেন প্রতি সকালে, এবং সর্বদাই তাঁর মেজাজ চড়া। কাল বাবুর্চিকে এমন পেটানি দিয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছিল... একজনও নেই, যাকে দিয়ে তোমায় চিঠি পাঠাই। তাই ডাক বাক্সে দিতে হয়েছে! ওহ্ হো, সবচেয়ে জরুরী কথাটাই বলতে ভুলে গেছি: মাদাম শিফোনকে বলে দিয়ো যে গতকালকার নমুনা মতো ব্লন্দটাকে যেন বদলে দেন। পারলে তিনি নিজে এসে আমায় নতুন প্যাটার্নটা দেখিয়ে গেলে ভালো হয়। বলো, যে কানেস্যু সম্পর্কে আমার মত বদলেছি: জিনিসটা এম্ব্রয়ডারি করতে হবে ক্রোচার দিয়ে। রুমালের ওপর মনোগ্রামগুলো সাটিনের ফোঁড় দিয়ে নয় তাম্বুর দিয়ে তুলতে হবে। কথাটা হল 'তাম্বুর' মনে থাকবে তো? আর একটা কথাও প্রায় ভুলেছিলাম আর কি। ওকে একটু বলো যে ফার-কোটের ঝুলটা একটু তুলে দিতে হবে আর ভেতরকার গাসেট্-টা হবে পাটকরা, কলারে থাকবে লেসের কুঁচি, কিংবা চওড়া ফালবালা। ভুলো না যেন, ঠিক তো?

তোমার

ভ. দ.

পুঃ আমার কাজগুলোর জন্যে তোমায় খাটিয়ে নিতে হচ্ছে বলে লজ্জিত। গত পরশু দিনও তোমায় সারা সকাল ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়েছে। কিন্তু সত্যি উপায় নেই। এখানে ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই, তার ওপর আমি অসুস্থ। তাই রাগ কোরো না, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। এত মন খারাপ করছে! কি হবে আমার, মাকার আলেক্সেয়েভিচ্। ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে ভয় লাগে। অশুভ কত কি দুর্ভাবনায় মন ভরা, দিন কাটাচ্ছি যেন একটা ঘোরের মধ্যে।

পুঃ পুঃ যা বলেছি দয়া করে ভুলো না কিন্তু। ভয় হচ্ছে, তুমি গণ্ডগোল করে বসবে। মনে রেখো: সাটিনের ফোঁড় নয়, তাম্বুর।

ভ. দ.

২৭শে সেপ্টেম্বর

প্রিয় ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না!

তোমার কথা মতো যা যা করার সব করেছি। মাদাম শিফোন বললেন, তিনি নিজেই তাম্বুরের ফোঁড় দিয়ে জিনিসটা করবেন, সেইটাই বেশি ভালো না কি-একটা

হবে বললেন, ঠিক মনে নেই। ফালবালা সম্পর্কেও তিনি কি যেন বলেছিলেন, ভুলে গেছি। এইটুকু মনে আছে যে ফালবালা সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু বলেছিলেন— বুড়ি মেয়েটা একেবারে মাথা খারাপ করে দেবার মতো! আর কি যেন উনি বলেছিলেন? সে সব তোমাকে বললেই উনি পারতেন। ছুটোছুটি করে আমি এখন প্রায় আধমরা, আফিসেও যাইনি। কিন্তু চিন্তা কোরো না, ডার্লিং। তোমার মানসিক শান্তির জন্যে আমি শহরের সবকটি দোকানে ছুটতে রাজী। লিখেছ, ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে তোমার ভয় লাগে। কিন্তু সাতটার সময় তো সবই তুমি জানতে পারবে। মাদাম শিফোন নিজে আসবেন বলেছেন। মন খারাপ কোরো না, ডার্লিং। হয়ত সবই মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু ঐ শালার ফালবালা কথাটা আমি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছি না। যত সব ফালবালা আর ফালবালা! তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব ডার্লিং, নিশ্চয় যাব। আসলে তোমাদের বাড়ির ফটকের সামনে দিয়ে আমি দুবার গিয়েছি, কিন্তু বীকভ মানে শ্রীযুক্ত বীকভ সবসময় এমন চটে থাকেন যে আমি সত্যিই আর... যাক, কি আর উপায়!

মাকার দেভুশ্‌কিন

২৮শে সেপ্টেম্বর

প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্।

লক্ষ্মীটি এক্ষুণি, এক্ষুণি স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বলো যে মুক্তো আর মরকত দেওয়া সেই দুল জোড়া তৈরি করতে হবে না। শ্রীযুক্ত বীকভ বলছেন যে, দামটা গলা কাটা। উনি একটু বিরক্তই হয়েছেন। বলছেন, এমনিতেই অনেক খরচা হয়ে গেছে তাঁর, তাঁকে নাকি প্রায় লুঠ করতে শুরু করেছি আমরা। গতকালও তিনি বলেছিলেন, এমন খরচ হবে জানলে তিনি নাকি কখনো কথা দিতেন না। তিনি বলছেন, বিয়ে হয়ে যাবার পরই আমরা চলে যাব, কোনো রকম অতিথি অভ্যাগতের ঝামেলা করা চলবে না। নেচে কুঁদে বেড়িয়ে লোকজনকে আপ্যায়ন করতে হবে এ সব যেন আমি না ভাবি। উৎসব করার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। ওঁর কথা বলার ধরণই অমনি! ঈশ্বর জানেন, এ সব জিনিসের জন্যে আমার কোনো আগ্রহই ছিল না, শ্রীযুক্ত বীকভ নিজেই এ সবের হুকুম দিয়েছিলেন। ওঁর কথায় আমি কোনো জবাব দিইনি, কেন না উনি সহজেই চটে যান। কি হবে আমার?

ভ. দ.

২৮শে সেপ্টেম্বর

ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না, সোনামণি আমার!

আমি... মানে স্বর্ণকার বলছে আচ্ছা, রাজী। এবং আমার কথা বলতে হলে, আমি প্রথমত বলতে চাইছি যে আমি অসুস্থ, শয্যা নিয়েছি। কপাল খারাপ। এত সব যখন করবার, ঠিক সেই সময়েই অসুখে পড়ে গেলাম। আমার নিজের এই বিপদ ছাড়াও হুজুর সম্প্রতি ভারি চটে গিয়েছিলেন বেচারী এমেলিয়ান ইভানভিচের ওপর, বকতে বকতে একেবারে দম যায় আর কি। এইটুকুই তোমায় জানাব ভাবছিলাম। আরো কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অযথা তোমার কষ্ট হবে। সাদাসিধে গোছের মানুষ আমি, খুব একটা বুদ্ধি নেই, যা মনে আসে তাই লিখে বসি। যা লিখি তা হয়ত সবসময় উচিত বলে তোমার মনে হবে না। কিন্তু, তাতে সত্যিই কিছু এসে যায় না।

তোমার

মাকার দেভুশ্কিন

২৯শে সেপ্টেম্বর

ভার্ভারা আলেক্সেয়েভ্না, বাছা আমার!

আজ ফেদোরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ডার্লিং, ও বললে, কাল তোমার বিয়ে এবং পরশু দিনই চলে যাবে, শ্রীযুক্ত বীকভ ঘোড়া ভাড়া করে ফেলেছেন। হুজুর সম্পর্কে সে খবরটুকু তো তোমায় আগেই দিয়েছি। তাছাড়া আর কি লিখি? ও হ্যাঁ, গরোখভায়ার দোকান থেকে যে বিলগুলো পাঠিয়েছে, তা আমি দেখেছি। সবই ঠিক আছে, তবে খরচা পড়ে গেছে বেশি। তাতে শ্রীযুক্ত বীকভ তোমার ওপর চটবেন কেন? যাই হোক, ভবিষ্যতে তুমি চিরকাল সুখী থেকো, ডার্লিং। তুমি সুখে আছ জানলে ভারি আনন্দ হবে আমার। পিঠে ব্যথাটা না থাকলে বিয়ের অনুষ্ঠান আমি দেখতে যেতাম। চিঠিগুলো সম্পর্কে ফের বলি... কে নিয়ে যাবে চিঠি? ফেদোরা... তুমি ওকে ভালো মতো যা দেবার দিয়েছ। বেশ দয়ামায়া আছে তোমার। এজন্যে ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করবেন। সৎকাজের পুরস্কার পাবেই পাবে, পুণ্য করলে তার কাছে ঈশ্বরের ন্যায় পৌঁছবেই। ডার্লিং আমার, আমার একমাত্র আপনজন, প্রতি ঘণ্টা প্রতি মিনিট তোমায় লিখতে

ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে শুধু লিখি আর লিখি। তোমার 'বেলকিনের গল্প' বইটা আমার কাছে আছে। এটা আমাকেই দিয়ে যাও। বইটা পড়তে যে খুব ইচ্ছে করছে তা ঠিক নয়; কিন্তু জানো তো, শীত আসছে, সন্ধ্যেগুলো হবে বড়ো দীর্ঘ আর বিষণ্ণ, তখন পড়বার সময় পাব অনেক। আমার ঘরটা ছেড়ে দিয়ে তোমার পুরনো বাসাটায় যেখানে এখন ফেদোরা আছে, সেখানে উঠে যাব। ভারি সৎ মেয়ে ওটি, ওকে আর ছাড়ব না। ভারি খাটতে পারে, জানো তো। কাল তোমার খালি ঘরখানায় গিয়েছিলাম, চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পায়চারি করলাম। দেখলাম কোণের দিকে তোমার সেই সুন্দর ছোট্ট এম্ব্রয়ডারি ফ্রেমখানা রয়েছে, তুমি যে কাজটা শুরু করেছিলে, সেটাও রয়েছে তাতে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, টুকিটাকি আরো অনেক কিছু চোখে পড়ল। আমার একটা চিঠিকে তুমি রেশমী সুতো জড়িয়ে রাখবার কাজে লাগিয়েছ। টেবিলের ওপরেও দেখলাম এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা: 'প্রিয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ্, তাড়াতাড়ি করে লিখছি...' বোধ হয় কেউ এসে পড়েছিল বলে তোমার লেখা আর হয়নি। কোণের দিকে, পর্দার আড়ালে তোমার ছোট্ট বিছানাটা দেখলাম। আদরের পাখি আমার!!!

বিদায়, বিদায় ভারেঙ্কা। ভগবানের দোহাই, শীগগিরই কিছু না কিছু উত্তর দিয়ো।

মাকার দেভুশ্‌কিন

৩০শে সেপ্টেম্বর

মাকার আলেক্সেয়েভিচ্‌, অকৃত্রিম বন্ধুবরেষু!

যা হবার হয়ে গেল, পাশার দান যা পড়বার পড়ে গেছে। কপালে কি আছে জানি না, তাঁর ইচ্ছাকেই মেনে নেব। কাল চলে যাচ্ছি, বিদায় চেয়ে এই পঙক্তি কটি লেখা, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু আমার, আমার রক্ষক, আমার প্রাণ! আমার জন্যে শোক কোরো না। সুখ হোক তোমার, আমায় মনে রেখো, ঈশ্বর সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকুন। তোমায় আমি ভুলব না, আমার প্রার্থনায় তোমার নাম করে যাব চিরকাল। এখানে যে জীবনটুকু কাটালাম এই তাহলে তার শেষ। এ স্মৃতির বেশির ভাগটা থেকেই আমি কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাব না, আর তাতে আরো বেশি প্রিয় হয়ে থাকবে তোমার স্মৃতি। তুমি আমার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র তুমিই আমায় ভালোবাসতে। আমি টের পেয়েছি, আমি জানতাম তুমি আমায় ভালোবেসেছ।

আমার একটু হাসি, আমার এক লাইন চিঠি— এতেই তুমি খুশি হয়ে উঠতে। এবার আমায় ভুলে যাও। কি রকম একলা লাগবে তোমার! কে তোমায় সান্ত্বনা দেবে? একমাত্র বন্ধু আমার, বইটা আর এম্ব্রয়ডারি ফ্রেম আর যে চিঠিটা লিখতে শুরু করেছিলাম, সেগুলো তোমার কাছেই রেখে গেলাম। প্রথম লাইনটা ফের পড়ো, আর বাকিটুকু সম্পর্কে যা ভালো লাগে ভেবে নিয়ো। ঈশ্বর জানেন কি যে লিখতে গিয়েছিলাম! হতভাগিনী ভারেঙ্কাকে তোমার মনে রেখো। খুব ভালোবাসত সে তোমায়। ফেদোরার আলমারির ওপরকার দেরাজে তোমার সব কটি চিঠি রেখে এসেছি। লিখেছ তুমি অসুস্থ। কিন্তু শ্রীযুক্ত বীকভ কিছুতেই আজ আমায় বেরুতে দিলেন না। তোমায় চিঠি লিখব কথা দিচ্ছি বৈকি, কিন্তু কি হবে কে জানে। তাই বিদায় চেয়ে রাখাই ভালো, চিরকালের জন্য বিদায় ডার্লিং, বিদায় আমার অন্তরের ধন!... তোমায় আলিঙ্গন দিতে পারলে কি সুখী না হতাম! বিদায় বন্ধু, বিদায়... চিরকাল কুশলে থেকো, সুখে থেকো! তোমার জন্যে প্রার্থনা করে যাব আমি। হৃদয় এত ভারাক্রান্ত যে বলার নয়। শ্রীযুক্ত বীকভ ডাকছেন।

তোমার চিরকালের ভালোবাসার ধন,

ভ.

পুঃ কান্নায়, কেবল কান্নায় ভরে উঠছে আমার প্রাণ… চোখের জলে গলা আটকে আসছে। বিদায়, হায় ভগবান, ভারি খারাপ লাগছে!

হতভাগিনী ভারেঙ্কাকে মনে রেখো!

* * *

ভারেঙ্কা আমার, আমার পাখি, একান্ত আপন আমার!

আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তোমাকে। চলে যাচ্ছ তুমি! এর চেয়ে বরং আমার হৃদয়টাকে ওরা ছিঁড়ে নিক! কি করে তুমি ওদের ছিনিয়ে নিতে দিলে? কাঁদছ তুমি, তবু চলে যাচ্ছ! চোখের জলে ভেজা তোমার চিঠিখানা এই মাত্র পেলাম। আসলে তুমি তো যেতে চাওনি, ওরা তো তোমায় জোর করে… তাহলে আমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে তোমার… তাহলে আমায় তুমি ভালোবাস! কিন্তু কে এখন তোমায় দেখবে? তোমার ছোট্ট হৃদয়খানা ভরে যাবে শীতে আর নিরানন্দে। দুঃখ কুরে কুরে খাবে তোমায়, শোকে ভেঙে পড়বে, নিঃসঙ্গের মতো মরণ হবে তোমার, ঠাণ্ডা মাটিতে ওরা তোমায় সমাধি দিয়ে আসবে, কেউ থাকবে না যে তোমার কবরের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদবে। শ্রীযুক্ত বীকভ খরগোশ শিকারে ব্যস্ত থাকবেন… হায় ডার্লিং, কি করে বসলে!

এমন একটা সিদ্ধান্ত তুমি কি করে নিতে পারলে! কি করেছ তুমি! এ কি অন্যায় তুমি করে বসলে নিজের ওপরে? ওরা তোমায় টেনে নিয়ে যাবে কবরে, ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তোমায় ঠেলে দেবে দুনিয়া থেকে। ছোট্ট একটি পালক যে তুমি, রাণী আমার! আর আমিই বা কোথায় ছিলাম এতক্ষণ? কি করছিলাম আমি বোকার মতো? আমি তো বুঝেছিলাম যে ছেলেমানুষ একটা ঝোঁক ধরেছে, অসুখ করেছে ওর। আমি যদি সোজাসুজি—কিন্তু না! বোকার মতো কাজ করেছি আমি। কিছু ভাবিনি, কিছু দেখতে চাইনি, যেন ব্যাপারটার সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই। হায় ভগবান! আমি ছুটেছি শুধু ফালবালার পেছনে। না ভারেঙ্কা, বিছানা ছেড়ে বেরুব আমি, কাল আমি সুস্থ হয়ে বিছানা ছেড়ে বেরুবই... তোমার গাড়ির চাকার তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি। তোমায় যেতে দেব না! এ অন্যায়! কি অধিকার আছে ওদের! তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি—আমায় যদি না নাও তাহলে তোমার গাড়ির পেছনে পেছনে আমি ছুটব। যতক্ষণ না পড়ে যাই ততক্ষণ ছুটে যাব! কোথায় চলেছ তুমি? সে কি জানো? চলেছ স্তেপ অঞ্চলে, জানো না যখন তখন আমায় জিগ্যেস করতে পারতে! নির্জন

ন্যাড়া স্তেপ, আমার এই হাতখানার মতোই ন্যাড়া! কাকে দেখবে সেখানে? শুধু বেদরদী চাষী বউ আর তাদের চোয়াড়ে চোয়াড়ে মাতাল মরদ। গাছগুলো থেকেও পাতা ঝরে পড়েছে! কেবল বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা। চলেছ সেই রকম একটা জায়গায়! শ্রীযুক্ত বীকভ অবশ্য ব্যস্ত থাকবেন তাঁর খরগোশ নিয়ে। আর তুমি? জমিদারের বৌ হয়েই কি তুমি থাকতে চাও, ডার্লিং?... তাহলে দেবী আমার, একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো। জমিদারগিন্নী বলে তোমায় একটুও কি মনে হয়? সে কথাই যে ওঠে না, ভারেঙ্কা! তাহলে, কার কাছে এবার চিঠি লিখব আমি? এক মুহূর্ত শুধু ভেবে দ্যাখো, কার কাছে লিখব? কাকে 'ভারেঙ্কা' বলে ডাকব? তখন কোথায় তোমায় পাব বলো? নিশ্চয় আমি আর বাঁচব না ভারেঙ্কা, এ শোক আমি সামলে উঠতে পারব না। দিব্য জ্যোতির মতো তোমায় আমি ভালোবাসতাম, ভালোবাসতাম আমার নিজের মেয়ের মতো। তোমার মধ্যেকার সবকিছু, তোমার চারপাশের সবকিছু আমি ভালোবাসতাম। ডার্লিং আমার, আমি যে বেঁচে ছিলাম শুধু তোমার জন্যেই! আমি কাজ করেছি, দলিল নকল করেছি, হেঁটে বেড়িয়েছি, আর যা দেখেছি তা চিঠিতে লিখে লিখে পাঠিয়েছি শুধু তুমি কাছে ছিলে

বলে। হয়ত তুমি সে কথা কখনো বোঝোনি, কিন্তু এই হল আসল কথা। আবার বলছি শোনো, এ কি করে সম্ভব, আমার ডার্লিং, যে তুমি চলে যাচ্ছ? তুমি যেতে পারো না। এ একেবারেই অসম্ভব। এ কথাই উঠতে পারে না। বৃষ্টি পড়ছে — নির্ঘাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার— তুমি যে ভারি দুর্বল, ভারি পলকা। গাড়ির ছাত ছুঁইয়ে নিশ্চয় জল ঝরবে। গাড়িটাই ভেঙে পড়বে: শহর ছেড়ে যেতে না যেতেই ও গাড়ি নিশ্চয় ভেঙে পড়বে। কিছুই বলা যায় না — পিটার্সবুর্গের গাড়ি-মিস্ত্রিগুলো একেবারে জঘন্য। সব ওদের জানি। ওরা শুধু ফ্যাশন আর ঝালরই বোঝে, শক্ত করে বানাতে জানে না। আমি দিব্যি দিয়ে বলছি, ওরা পারেই না। হাঁটু গেড়ে আমি শ্রীযুক্ত বীকভের সামনে বসে পড়ব, ডার্লিং। ওর কাছে প্রমাণ করব আমি, সবকিছু প্রমাণ করে দেব। আর তুমিও, মধুময়ী আমার, তুমিও ওঁকে বুঝিয়ো! ওঁকে বলো যে তুমি যেতে পারো না, এখানেই থাকবে!... হায়, হায়, কেন যে উনি সেই মস্কোর ব্যবসায়ীর মেয়েটিকে বিয়ে করলেন না! অনেক ভালো হত তাহলে। ব্যবসায়ীর মেয়েই তাঁর বেশি যোগ্য। অনেক বেশি যোগ্য। সে তো আমি একেবারে নিশ্চয় জানি। তাহলে তো তুমি এখানে থাকতে পারতে, আমার কাছে।

শ্রীযুক্ত বীকভের কি প্রয়োজন তোমার? কি করে তিনি তোমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন? হয়ত বা ওই ফালবালার জন্যে, বোধ হয় এই কারণেই। তাছাড়া, ফালবালারই বা কি অর্থ? ফালবালার কথাটা তোলারই কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো মানে হয় না, ডার্লিং। প্রশ্নটা ফালবালা নিয়ে তো নয়, এ হল একটা জীবন মরণ প্রশ্ন। ফালবালা তো শুধু এক টুকরো কাপড়: ফালবালা তো শুধু একটা হতচ্ছাড়া ন্যাকড়া! আমার মাইনে পাওয়া পর্যন্ত একটু সবুর করো, যতো চাও সব ফালবালা তোমায় কিনে দেব, ডার্লিং। আমারও চেনা দোকান আছে। মাইনে পাওয়া পর্যন্ত একটু সবুর করো, আমার দেবী! ও ভারেঙ্কা, হায় ভগবান। সত্যিই তুমি তাহলে শ্রীযুক্ত বীকভের সঙ্গে চলে যাবে? চিরকালের মতো চলে যাবে? হায় ভারেঙ্কা! না, না! ফের চিঠি লিখো তুমি: শুধু আর একবারের জন্যে লিখো। তারপর স্তেপ অঞ্চল থেকে ফের আর একটি। তা না লিখলে, এই যে চিঠি লিখেছ এইটেই যে তাহলে শেষ চিঠি হয়ে দাঁড়াবে; সে যে অসম্ভব। এ চিঠি যে শেষ চিঠি হতেই পারে না। সে কি করে হয়? কথা নেই, বার্তা নেই—হঠাৎ শেষ চিঠি! আমি তোমায় লিখেই যাব। তুমিও আমায় লিখো ...

আমার স্টাইলটা সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে... কিন্তু স্টাইল আবার কি? কি বলছি কি লিখছি কিছু খেয়ালই নেই আমার। তাতে কিছু এসেও যায় না, শুধু লিখে, কেবল লিখে যেতে পারলেই আমার হল... ছোট্ট পাখিটি আমার, শুধু একটি, শুধু একমাত্র ধন আমার, আমার ডার্লিং!

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

২১ জুবোভস্কি বুলভার মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

'... আগে আমি যাকে প্রধানত মানবতাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছি সে ধারার এক প্রধান ধারক হলেন:... দস্তয়েভ্স্কি। 'অভাজন' বইটি গোগলের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য এবং বেলিন্স্কির সবলতম ভাবাদর্শ দ্বারা সরাসরি অনুপ্রাণিত। দস্তয়েভ্স্কি এখানে আমাদের হতভাগ্য বাস্তবতার অস্বাভাবিকতা বর্ণনা করেছেন তরুণ এক প্রতিভার বলিষ্ঠ আবেগ নিয়ে এবং তার মধ্য থেকে রূপায়িত করে তুলেছেন তাঁর মহান মানবতাবাদী আদর্শটিকে।'

ন. দব্রলিউবভ

'হাসায় অথচ পাঠকের মর্মস্পর্শ করে যায়, হাসায় অশ্রুর মধ্যে দিয়ে — কি ওস্তাদি, কি প্রতিভা।'

ভ. বেলিন্স্কি